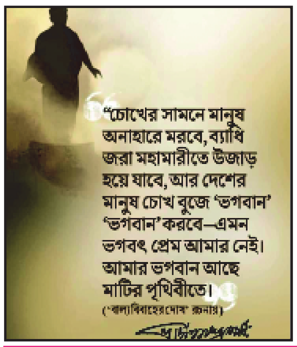

সংগ্রামী হাতিয়ার

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র

ভারতে হিটলারের ছায়া

তৃতীয় ও চতুর্থ সংস্করণ, জুলাই-আগস্ট ২০২১ ■ ৪৯তম বর্ষ ■ মূল্য ২ টাকা

রাজ্য কো–অর্ডিনেশন কমিটির পত্র

সমীপে,
মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী,
পশ্চিমবঙ্গ,
নবান্ন, হাওড়া

বিষয় ঃ রাজ্য সরকারী কর্মচারী, রাজ্য কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত বিভিন্ন স্ব-শাসিত সংস্থার কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সহ সাধারণ মানুষের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কয়েকটি জরুরি প্রসঙ্গ

শ্রদ্ধেয় মহাশয়া,

রাজ্য প্রশাসনের কর্ণধার এবং এ দেশের একজন প্রতিষ্ঠিত রাজনীতিবিদ হিসেবে, কেন্দ্রীয় সরকারের একমুখী কর্পোরেট তোষণকারী নীতিসমূহের বহুমাত্রিক নেতিবাচক অভিঘাত সম্পর্কে আপনি সম্যক অবহিত রয়েছেন। প্রাক্ কোভিড পর্ব থেকেই অনুসৃত এই নীতিসমূহের অভিমুখ, কোভিড অতিমারি পর্বেও অপরিবর্তীত থাকার ফলে, সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকা সংশ্লিষ্ট সঙ্কটের মাত্রা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গও খুব স্বাভাবিকভাবেই দেশের একটি অঙ্গরাজ্য হিসেবে এই সঙ্কটের বাইরে নয়।

এমতাবস্থায় আপনার নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারের কাছে রাজ্যবাসীর প্রত্যাশা দ্বিবিধ—(১) কেন্দ্রের জনস্বার্থবিরোধী নীতিসমূহের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক স্তরে প্রতিবাদ এবং একই বিষয়ে গড়ে ওঠা সাধারণ মানুষের আন্দোলনের পাশে দাঁড়ানো, এবং (২) রাজ্য সরকারের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যেও সমাজের সব অংশের মানুষের (পেশাগত সংগঠিত / অসংগঠিত বিভাজন নির্বিশেষে) ন্যায্য চাহিদা ও দাবি পূরণে সচেষ্ট হওয়া।

উপরোক্ত দ্বিবিধ প্রত্যাশার ভিত্তিতেই আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত ছ'দফা দাবি আপনার সুবিবেচনা ও কার্যকরী পদক্ষেপের অনুরোধ জানিয়ে পেশ করা হচ্ছে।

দাবিসমূহ ঃ

(১) অবিলম্বে পেট্রোপণ্য সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি রোধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (২) সকলের জন্য বিনামূল্যে ভ্যাকসিন সরবরাহের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করতে হবে। (৩) শূন্যপদে স্থায়ী নিয়োগ করতে হবে। নিয়োগের ক্ষেত্রে অস্থায়ী কর্মচারীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। (৪) কেন্দ্রীয় হারে বকেয়া ২৫ শতাংশ মহার্ঘভাতা অবিলম্বে প্রদান করতে হবে। (৫) প্রতিহিংসামূলক বদলীর আদেশনামা প্রত্যাহার ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার প্রদান করা সহ সাম্প্রদায়িক বিভেদমূলক রাজনীতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (৬) ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কীমে ক্যাশলেস চিকিৎসার ঊর্ধ্বসীমা ১ লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৫ লক্ষ টাকা করা এবং জেলাগুলির অভ্যন্তরে বিভিন্ন বেসরকারী চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানকে এই স্কীমের তালিকাভুক্ত করা।

ভবদীয়

বিজয় শংকর সিংহ

(বিজয় শংকর সিংহ)
সাধারণ সম্পাদক
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

তারিখ ঃ ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২১

আগস্ট মাস জুড়ে

ব্লক থেকে জেলা সদর ডেপুটেশন কর্মসূচী

আলিপুরদুয়ার

বর্ধমান

বাঁকুড়া

উত্তর ২৪ পরগনা

পেট্রোপণ্য সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি রোধ, কেন্দ্রীয় হার অনুযায়ী বকেয়া ২৫ শতাংশ মহার্ঘভাতা অবিলম্বে প্রদান, রাজ্য প্রশাসনের সর্বস্তরে লক্ষাধিক শূন্যপদে স্থায়ী নিয়োগ এবং নিয়োগের ক্ষেত্রে চুক্তিপ্রথায় কর্মরত অনিয়মিত কর্মচারীদের অগ্রাধিকার প্রদান, নীতিহীন প্রতিহিংসামূলক সমস্ত বদলির আদেশনামা প্রত্যাহার, বিনামূল্যে সর্বজনীন টিকাকরণের লক্ষ্যে টিকার পর্যাপ্ত যোগানের ন্যায় কর্মচারী ও জনসাধারণের স্বার্থবাহী পাঁচ দফা দাবি নিয়ে আগস্ট মাসজুড়ে ডেপুটেশন ও বিক্ষোভ জমায়েতের কর্মসূচী নিয়েছে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। আগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ব্লক স্তরে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কাছে কেন্দ্রীয় পাঁচ দফা দাবির সাথে স্থানীয় একটি দাবিকে যুক্ত করে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। কোভিড বিধি সহ বিভিন্ন ধরনের প্রশাসনিক প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করেই দু'শতাধিক ব্লকে ডেপুটেশন কর্মসূচী সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ডেপুটেশন পর্বে উল্লিখিত ছ'দফা দাবি সনদ আধিকারিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়, যা তাঁরা সুপারিশ সহ সংশ্লিষ্ট মহকুমা শাসকদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন। এই কর্মসূচীর দ্বিতীয় ধাপে মহকুমা শাসকদের কাছে কেন্দ্রীয় দাবির সাথে মহকুমা স্তরের একটি দাবিকে যুক্ত করে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ব্লক ও মহকুমায় ডেপুটেশনের পাশাপাশি কর্মচারী জমায়েত করে দাবি প্রস্তাব গ্রহণ ও সংক্ষিপত সভা অনুষ্ঠিত হয়।

২৭ আগস্ট, সারা রাজ্যে জেলা শাসকদের কাছে একই দাবিতে ডেপুটেশন দেয় সংগঠন। এই দিন প্রতিটি জেলা সদরে কর্মচারী সমাবেশ হয়। এই সমাবেশে সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বগণ বক্তব্য রাখেন। একমাসব্যাপী এই কর্মসূচীর শেষ পর্বে, আগামী ৮ সেপ্টেম্বর বেলা ১২টায় নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে পাঁচ দফা দাবি সনদের ভিত্তিতে তাঁর সাথে আলোচনা করবে সংগঠনের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল। এই মর্মে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর সময় চেয়ে সংগঠনের পক্ষ থেকে নবান্নে পত্র প্রেরণ করা হবে। ঐ দিনেই কলকাতার রানী রাসমনি এভিনিউতে কর্মচারী জমায়েতের কর্মসূচী রয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রশাসকদের কাছে এই সভার অনুমতিও ইতিমধ্যেই চাওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সারা মাসব্যাপী এই কর্মসূচীগুলি কোভিড বিধি মেনেই প্রতিপালিত হয়েছে। □

দক্ষিণ দিনাজপুর

মালদা

পুরুলিয়া

নদীয়া

সংগ্রামী হাতিয়ার

সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপনের সূচনা

আলোচককে সংবর্ধনা জানাচ্ছেন বিজয় শংকর সিংহ

১৯৭১ সালের ৭ মে প্রথম আত্মপ্রকাশ সংগ্রামী হাতিয়ারের। তারপর থেকেই, ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থার সময়টুকু বাদ দিলে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র সংগ্রামী হাতিয়ার। এবছর এই পত্রিকা প্রকাশনার ৫০তম বার্ষিকী। মুখপত্রের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষটিকে বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সংগঠনের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারক সংস্থা রাজ্য কাউন্সিল। এবছর গত ২ আগস্ট বছরব্যাপীর কর্মসূচী সূচনা হল একটি আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে। আলোচনা সভার বিষয় ছিল : 'কর্পোরেট পন্থী হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের গর্ভে বামপন্থার সম্ভাবনা'। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রতন খাসনবীশ। ২ আগস্ট কর্মচারী ভবনে অরবিন্দ সভাকক্ষে আয়োজিত

অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক টিমের সঙ্গীত পরিবেশন

আলোচক রতন খাসনবিশ

এই আলোচনায় সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি আশিষ ভট্টাচার্য্য। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিংহ এবং সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার সম্পাদক সুমিত ভট্টাচার্য। উভয় বক্তাই সংগঠন আন্দোলনে মুখপত্রের গুরুত্ব এবং গত ৫০ বছর ধরে বিভিন্ন পরিস্থিতি সম্পর্কে কর্মচারীদের মধ্যে সাধারণ বোঝাপড়া গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই পত্রিকার ভূমিকা উল্লেখ করেন। □

(রতন খাসনবিশের বক্তব্যের অংশ বিশেষ সপ্তম পৃষ্ঠায়)

সম্পাদকীয়

করোনাকালে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি

প্রায় দু'বছর হতে চলল, কোভিডের বিপদ মাথার ওপরে নিয়ে দিন কাটাচ্ছি আমরা। এখানে 'আমরা' অর্থে অনেক কিছুই ধরে নেওয়া যায়। বিশ্ববাসী, দেশবাসী বা রাজ্যবাসী। এমনকি 'আমরা' অর্থে শুধুমাত্র রাজ্য সরকারী কর্মচারীও হতে পারে। কারণ যে অর্থেই 'আমরা' কথাটি ব্যবহৃত হোক না কেন, কোভিড-১৯-এর বিপদ সকলকেই তাড়া করে বেড়াচ্ছে। কোনো দেশের সীমানাকে তোয়াক্কা না করে কোভিড-১৯-এর এই সর্বত্রগামী চরিত্রের সাথে, আন্তর্জাতিক লগ্নীপুঁজির বেপরোয়া ছুটে বেড়ানোর একটা মিল রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে একটা পার্থক্য হল, এক দেশ থেকে আর এক দেশের সীমানা অতিক্রম করে প্রবেশ করার জন্য কোভিড-১৯-এর সেই দেশের সরকারের সাহায্য বা অনুমোদন লাগে না। কিন্তু লগ্নীপুঁজির সর্বত্রগামী চরিত্র সত্ত্বেও তার এই ক্ষমতা নেই। তাকে নির্ভর করতে হয় নির্বাচিত সরকারের ভূমিকার ওপর। রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনের বিধি-নিষেধ শিথিল করলে তবেই লগ্নীপুঁজি সে দেশের বাজারে থাবা বসাতে পারে। লগ্নীপুঁজি এক বাজার থেকে আর এক বাজার ছুটে বেড়ায় নিজেকে বেশি বেশি করে পুষ্ট করার জন্য বা গুণিতক হারে মুনাফা বৃদ্ধির জন্য। আর সার্স-ভাইরাস পরিবারের সদস্য কোভিড-১৯ এক মানব দেহ থেকে আর এক মানব দেহে বাসা বাঁধে শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য। কারণ সজীব কোষ থেকেই সে বেঁচে থাকার রসদ জোগার করে। লগ্নীপুঁজি স্বাধীন নয়। সে বহুজাতিক কর্পোরেশনের ভৃত্য। তাই তার গতিশীলতার একটি নির্দিষ্ট 'প্যাটার্ন' রয়েছে, রয়েছে একটি 'টার্গেট' গ্রুপ। কিন্তু কোভিড ভাইরাসের গতিশীলতা 'র‍্যানডম' এবং নির্দিষ্ট কোনো টার্গেট গ্রুপও নেই।

কিছু মিল ও কিছু অমিলের বাইরে এই দুইয়ের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কের দিকটিতেও নজর দেওয়া যেতে পারে। আন্তর্জাতিক লগ্নীপুঁজির মুনাফার উদগ্র লোভের কারণেই প্রাকৃতিক সম্পদের নির্বিচার ধ্বংস সাধনের কাজ চলছে। এই নির্বিচার ধ্বংস সাধনের ফলেই হাজার হাজার বছর ধরে প্রকৃতির কোলে লুকিয়ে থাকা জীবাণু মানুষের সমাজ জীবনে অনুপ্রবেশের ছাড়পত্র পেয়ে যাচ্ছে। এটা যদি আন্তঃসম্পর্কের একটা দিক হয়, তাহলে অপর দিকটি হল কোভিড সংক্রমণের ফলের সাধারণ মানুষের যে বিপন্নতা, তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করছে আন্তর্জাতিক লগ্নীপুঁজি। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বিভিন্ন দেশের সরকার করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধমূলক যে সমস্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, তার ফলে স্ব স্ব দেশের অর্থনীতির স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ হয়েছে। এর বিপর্যয়কর প্রভাব পড়েছে সিংহভাগ মানুষের জীবিকার ওপর। অথচ এই সময়কালেই, লগ্নীপুঁজি যাদের স্বার্থে বিশ্বময় ছুটে বেড়ায়, তাদের সম্পদ সঞ্চয়ের প্রক্রিয়া এতটুকু ব্যহত হয়নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৃদ্ধিও পেয়েছে। প্রশ্ন উঠতে পারে, এটা কী করে সম্ভব? করোনাকালের একটা বড় সময় জুড়ে যখন পণ্য ও পরিষেবা উৎপাদনের কাজ কার্যত বন্ধ (লকডাউন) ছিল, তখন মুনাফা অর্জন এবং তা থেকে সম্পদ বৃদ্ধি কীভাবে ঘটল? এর উত্তর লুকিয়ে রয়েছে আন্তর্জাতিক লগ্নীপুঁজির বিশেষ 'ফাটকা' চরিত্রের মধ্যে। লগ্নীপুঁজি অর্থনীতির M→ C→M'— এই চেনা পথের বাইরে, আরও একটা পথ অনুসরণ করে। যা হল M→M'। যেখানে 'C' অর্থাৎ 'কমোডিটি' বা পণ্য উৎপাদনের কোনো বিষয় নেই। শুধুমাত্র বিনিয়োগ এবং তা থেকে বর্ধিত রিটার্ন। অর্থাৎ মুনাফা। এই বিনিয়োগের ক্ষেত্রটি হল শেয়ার বাজার। 'মানি' (M) থেকে সরাসরি আরও বেশি মানি (M') তৈরি করে যে লগ্নীপুঁজি, তার পোষাকি নাম—এফ আই আই বা 'ফরেন ইনস্টিটিউশনাল ইনভেস্টমেন্ট'। আজ বিশ্ব অর্থনীতিতে পণ্য ও পরিষেবা উৎপাদনকারী লগ্নীপুঁজির প্রবাহের (এফ ডি আই বা ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট) তুলনায় এফ আই আই-এর প্রবাহ অনেক বেশি স্রোতস্বিনী। তাই লকডাউনের কারণে অর্থনীতির চাকা দৃশ্যত বিভিন্ন দেশে বন্ধ থাকলেও, সেইসব দেশের শেয়ার বাজারের সূচককে টেনে নামাতে পারেনি। উদাহরণ আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে। গত বছর (২০২০) এপ্রিল-মে মাস জুড়ে সম্পূর্ণ লকডাউনের কারণে যখন আমাদের দেশের ১৫ কোটি মানুষ কাজ হারিয়েছেন, ঠিক তখনই একজন শীর্ষ শিল্পপতি প্রতি ঘণ্টায় ৯০ কোটি টাকার সম্পদ সঞ্চয় করেছেন।

তবে একথাও ঠিক, লগ্নীপুঁজির মুনাফা অর্জনের শর্টকাট পদ্ধতিকে মদত দেয় যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, তার বৈধতাই অর্থনীতির স্বাভাবিক গতিরুদ্ধ থাকলে একসময় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। কারণ কর্মহীনতা, দারিদ্র, অভাব, অনটন ইত্যাদি কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে ক্ষোভ তৈরি হয়, তা একসময় রাজনৈতিক দিক থেকে এই ব্যবস্থার অসারতার বিরুদ্ধে সরব হতে পারে। আর সেই রাজনৈতিক প্রতিরোধ যদি কোনো বিকল্প ভাষ্যকে বহন করে, তাহলে লগ্নীপুঁজির মুনাফা অর্জনের শর্টকাট পদ্ধতিও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে পারে। এই সম্ভাবনাকে মোকাবিলা করার দুটি রাস্তা রয়েছে—(১) সাধারণ মানুষের কাছে কিছু রিলিফ পৌঁছে দেওয়া। যা তাঁদের জীবিকার সঙ্কটের বিকল্প না হলেও, সাময়িক কিছু স্বস্তি অন্তত দিতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ বেশ কিছু উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশ করোনা অতিমারি পর্বে এই রাস্তা গ্রহণ করেছে। (২) রাষ্ট্রীয় দমননীতিকে ব্যবহার করে, গণতন্ত্রের পরিসরকে সঙ্কুচিত করে গণবিক্ষোভ এবং তার জঠরে পালিত বিকল্প ভাষ্যকে দমন করা।

দ্বিতীয় পথটির অনুসরণকারীর আদর্শ উদাহরণ আমাদের দেশের সরকার। সাধারণভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির ঘোর সমর্থক হলেও এবং তদনুযায়ী আমাদের দেশের বৈদেশিক নীতির অভিমুখ পরিবর্তনে আর এস এস-বিজেপি সরকার ভীষণভাবে ঐকান্তিক হলেও, করোনা অতিমারি পর্বে সাধারণ মানুষকে 'রিলিফ' দেওয়ার প্রশ্নে কিন্তু তারা মার্কিন সরকারকেও অনুসরণ করেনি। আসলে এক্ষেত্রে আর এস এস তার নিজস্ব আদর্শগত অবস্থান অনুযায়ী যে লক্ষ্য স্থির করেছে, তাকে তারা কোনো কারণেই এমনকি সাময়িকভাবেও সরিয়ে রাখতে নারাজ। এর কারণটাও খুব স্পষ্ট। পরপর দু'বার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠনের এই সুযোগকে ব্যবহার করে, তারা তাদের লক্ষ্যে যতদূর সম্ভব এগিয়ে যেতে চাইছে। এটা আরও বোঝা যায়, যখন দেখা যায়, প্রথমবারের (২০১৪-১৯) থেকেও দ্বিতীয়বারে তাদের মরীয়া ভাবটা অনেকটাই বেশি। দ্বিতীয় পর্বের শাসন পদ্ধতিও তাই অনেক বেশি আগ্রাসী। একটা ছোট্ট উদাহরণ এক্ষেত্রে দেওয়া যেতে পারে। কেন্দ্রের শাসকদলের সংসদের নিম্নকক্ষে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। ফলে যে কোনো বিলকে অন্ততপক্ষে সংসদের নিম্নকক্ষে সংখ্যার জোরে অনুমোদন করিয়ে নেওয়া তাদের কাছে সহজ কাজ। সেক্ষেত্রে বিরোধী দলগুলিকে বিভিন্ন বিলের ওপর আলোচনার সুযোগ দিয়েও, সংখ্যার জোরে বিলগুলিকে লোকসভায় পাশ করিয়ে নেওয়া, তাদের কাছে অসম্ভব নয়। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বে আমরা কী দেখছি? গুরুত্বপূর্ণ বিলগুলির ওপর এমনকি আলোচনা করার সুযোগটুকুও তারা বিরোধীদের দিতে চায় না। তাই মার্শাল দিয়ে বিরোধী সদস্যদের সংসদ কক্ষ থেকে বের করে দিয়ে বিল পাশ করানোর মতো ঘটনাও ঘটেছে। এর অর্থ গণতন্ত্রের ন্যূনতম চর্চাটুকুও তাদের না পসন্দ্। লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য এতটাই মরীয়া ভাব। অবশ্য সংসদীয় রীতি পদ্ধতিকে দুমরে-মুচরে দেওয়ার মধ্যে একটা আদর্শগত ফ্লেভারও রয়েছে। কারণ আর এস এস সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ঘোরতর বিরোধী।

যে লক্ষ্যের দিকে তারা খুব দ্রুত ধাবিত হচ্ছে, তা হল ভারত নামক ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্রটিকে একটি হিন্দুরাষ্ট্রে পরিণত করা। ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ হলেও, স্বাধীনতা প্রাপ্তির লগ্নে যে স্বপ্ন তাদের অপূর্ণ থেকে গেছে, তাকে পূরণ করা। 'হিন্দুরাষ্ট্র'-এর স্বরূপ বহুল আলোচিত। তার উপরিকাঠামোর বিভিন্ন অনুষঙ্গ প্রসঙ্গে আলোচনাকে বাদ রেখে, আমরা আপাতত হিন্দুরাষ্ট্রের অর্থনীতি সম্পর্কে আর এস এস-র অবস্থানকে বোঝার চেস্টা করতে পারি। কারণ তাহলেই করোনা অতিমারিকালেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা একাধিক পশ্চিমী দেশকে অনুসরণ না করার রহস্যটা পরিষ্কার হবে। আর এস এস তার জন্মলগ্ন থেকেই সম্পত্তির অধিকারকে তাদের ভাষ্য অনুযায়ী 'পবিত্র' অধিকার বলে মনে করে। স্বভাবতই শোষণের মাধ্যমে সৃষ্ট 'সম্পদ'ও তাদের কাছে পবিত্র এবং সম্পদবান সেই পবিত্রতার প্রতিনিধি। অপরদিকে আর এস এস ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্রী শাসন প্রণালীকে আদর্শ বলে মনে করে। আর ফ্যাসিবাদ হল লগ্নীপুঁজির সর্বাধিক প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিনিধি। স্বভাবতই আদর্শগত অবস্থান থেকেই আর এস এস লগ্নীপুঁজির একনিষ্ঠ সমর্থক। এই কারণেই পরাধীন ভারতে প্রতিষ্ঠিত হলেও আর এস এস কখনোই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তথা ব্রিটিশ লগ্নীপুঁজির বিরোধিতা করেনি। বরং ব্রিটিশ শাসনকে এদেশের ক্ষেত্রে তারা আশীর্বাদ বলেই মনে করত। নয়া উদারবাদী অর্থনীতির পর্বে লগ্নীপুঁজি জাতীয় চরিত্র থেকে বহুজাতিক চরিত্র অর্জন করেছে। কিন্তু লগ্নীপুঁজি তা সে জাতীয় চরিত্রের বা বহুজাতিক যাই হোক না কেন, যখনই সঙ্কটের আবর্তে নিমজ্জিত হয় তখনই স্বৈরতান্ত্রিক চরিত্র সম্পন্ন রাজনৈতিক শক্তিকে নিজের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে। স্বভাবতই, বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকের শেষার্ধ থেকে সঙ্কটে নিমজ্জিত আন্তর্জাতিক লগ্নীপুঁজি, ভারতের বাজারকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ফ্যাসিস্ট একনায়কতন্ত্রী শাসনের অনুগামী আর এস এস-বিজেপিকে ব্যবহার করছে। বিপরীতে আর এস এস-বিজেপিও করোনা অতিমারি পর্বে সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকার সঙ্কটকে তোয়াক্কা না করে লগ্নীপুঁজির তথা কর্পোরেট পুঁজির সুবিধার্থে একের পর এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে চলেছে।

বৃহৎ কর্পোরেট পুঁজি ও আন্তর্জাতিক লগ্নীপুঁজিকে তুষ্ট রাখার এই প্রক্রিয়া তাদের হিন্দুরাষ্ট্র প্রকল্পের সথেও নিশ্চিতভাবে সঙ্গতিপূর্ণ। কারণ, হিন্দুরাষ্ট্রের অর্থনীতির স্বরূপ সম্পর্কে আর এস এস-র সংঘ চালকদের আলোচনায় খুব বেশি কিছু পাওয়া না গেলেও, সম্পত্তির অধিকারের পবিত্রতা সম্পর্কে তাদের ধারণা, অতীতে ব্রিটিশ লগ্নীপুঁজি তথা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে তাদের অবস্থান এবং বর্তমান সময়ে গৃহীত আর্থিক নীতির অভিমুখ থেকে খুব সহজেই বুঝে নেওয়া যায়, হিন্দুরাষ্ট্রের অর্থনীতি ঠিক কেমন হবে।

স্বভাবতই একথা স্পষ্ট যে, শুধুমাত্র আর এস এস-বিজেপি সরকারের ধর্মীয় বিভাজনমূলক বিভিন্ন পদক্ষেপের বিরোধিতা করে 'হিন্দুরাষ্ট্র' নামক প্রকল্পটিকে প্রতিহত করা সম্ভব নয়। একে প্রতিহত করতে হলে একই সাথে কর্পোরেট পন্থী আর্থিক নীতিরও বলিষ্ঠ বিরোধিতা করা প্রয়োজন। এখানেই বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি ব্যতীত, অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির অশেষ দুর্বলতা রয়েছে। ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবেই বিরাজ করুক এটা তারা চায়, কিন্তু দেশের অর্থনীতিকে কর্পোরেট পন্থী ট্র্যাজেকটরি থেকে বের করে এনে সাধারণ মানুষকে কিছুটা হলেও স্বস্তি দেওয়া হোক, এই চাওয়াটার ক্ষেত্রে যথেষ্ট দোদুল্যমানতা রয়েছে। এই কারণেই হিন্দুরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা বিরোধী লড়াইটা অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়ছে। একমাত্র বামপন্থীরা একইরকম দৃঢ়তা নিয়ে এই দুয়েরই বিরোধিতা করে চলেছে গত তিরিশ বছর ধরে। এই প্রেক্ষিতে সাম্প্রতিক সময়ের দুটি পরস্পর বিরোধী অভিজ্ঞতার মুখোমুখি আমরা হয়েছি। হিন্দুরাষ্ট্র প্রকল্পের নিরিখে যার একটি ইতিবাচক, অপরটি নেতিবাচক। ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে বর্তমান সময়ের কৃষক আন্দোলন। কারণ এই আন্দোলন একই সাথে কর্পোরেট পন্থী নীতির (কৃষি আইন) বিরোধিতা করছে। অপরদিকে ধর্ম-বর্ণ-ভাষা নির্বিশেষে ঐক্যের বার্তা বহন করছে। নেতিবাচক ভূমিকার উদাহরণ স্থাপন করছে আমাদের রাজ্যের শাসকদল। প্রথমত তারা নিজেদের মতো করে আর এয এস ও বিজেপি-র মধ্যে একটা মনগড়া বিভাজন রেখা টেনে বলার চেষ্টা করছে আর এস এস নির্বাচনে লড়ে না, তাই তাদের সাথে কোনো বিরোধ নেই। অর্থাৎ হিন্দুরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনার মূল হোতাটিকে কৌশলে আড়াল করা হচ্ছে। এমনকি বিজেপি বিরোধিতার প্রশ্নেও, সুনির্দিষ্ট নীতি সমূহের বিরুদ্ধে ভাষা ভাষা কিছু কথা বলে, তুলনামূলকভাবে অপ্রয়োজনীয় বা কম গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে উচ্চগ্রামে তরজা করে মানুষের দৃষ্টিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কৃষক আন্দোলন গোটা দেশজুড়ে যে ন্যারেটিভ তৈরি করছে, তার ঠিক বিপরীত ন্যারেটিভ তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে আমাদের রাজ্যে। তাই কেন্দ্রের শাসকদলের কাছে কৃষক আন্দোলন যতটা অস্বস্তিকর, ঠিক ততটাই স্বস্তিদায়ক এ রাজ্যের শাসকদলের ভূমিকা। এই অরাজনৈতিক ভাষ্য সমৃদ্ধ ন্যারেটিভ পশ্চিমবাংলায় বাম আন্দোলনকে দুর্বল করে, তার শাখা-প্রশাখার বিস্তার ঘটিয়েছে। এখন সম্ভবত টার্গেট, বাম আন্দোলনের অপর শক্তিশালী ঘাঁটি ত্রিপুরা। যে রাজনৈতিক মেরুকরণ বামেদের কোণঠাসা করে পশ্চিমবাংলার বুকে জাঁকিয়ে বসেছে, ত্রিপুরাতেও বামপন্থীদের কোণঠাসা করার জন্য একই ধরনের মেরুকরণের রাজনীতির মডেলকে রপ্তানি করা হচ্ছে।

এই পরিকল্পনায় দোহারের কাজ করছে, কর্পোরেট পুঁজি পরিচালিত প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া। অরাজনৈতিক উপাদানে সমৃদ্ধ রাজনৈতিক মেরুকরণকে জনমানসে বৈধতা প্রদানের কাজ করছে মিডিয়া। পশ্চিমবঙ্গে এই পরিকল্পনা অনেকাংশে সফল হওয়ার পরে, এখন টার্গেট ত্রিপুরা। এই পরিকল্পনাকে ভেস্তে দিতে হলে একইসাথে লড়াই চালাতে হবে—তিন শক্তির বিরুদ্ধে দেশী-বিদেশী কর্পোরেট পুঁজি, ধর্মীয় মেরুকরণ এবং পোস্টট্রুথের ফ্যাক্টরি মাসমিডিয়া। লড়াইটা কঠিন এবং দীর্ঘস্থায়ী। কিন্তু ঠিকমতো লড়তে পারলে জয় ছিনিয়ে আনা সম্ভব। □

২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২১

প্রশাসনিক উৎপীড়নে কাঁথিতে আত্মঘাতী সরকারী ইঞ্জিনিয়ার

কাঁথি ১নং ব্লকের সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, ৪৫ বছর বয়সের তারণ কুমার পতি ব্লাড সুগারের রোগী। কলকাতায় ডাক্তার দেখানোর জন্য মাত্র একদিনের ছুটি চেয়েছিলেন সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের (বিডিও) কাছে। কিন্তু ছুটি মঞ্জুর হয়নি। মাত্র একদিনের ছুটির জন্য বার বার আবেদন করার পরেও ছুটি না মঞ্জুর হওয়ায় মানসিক অবসাদে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন ঐ জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার। এটি আত্মহত্যার ঘটনা হলেও, প্রশাসনিক কাজের অত্যধিক চাপ আর প্রশাসনিক কর্তাদের অমানবিক আচরণই দুই নাবালক সন্তানের পিতা তারণ কুমার পতিকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করেছে বলে স্পষ্ট অভিযোগ জানিয়েছেন ঐ ব্লকে তাঁর সহকর্মীরা। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কাঁথি মহকুমার শাখার পক্ষ থেকে মহকুমা শাসকের কাছে এই অনভিপ্রেত ঘটনার যথাযথ তদন্ত করে, এই দুঃখজনক পরিস্থিতির জন্য যারা দায়ি, তাদের শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে।

১২ সেপ্টেম্বর এই ঘটনার খবর সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সারা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়তেই তীব্র ক্ষোভ সঞ্চারিত হয় কর্মচারী সমাজে। কারণ এঁদের একটা বড় অংশই একই ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছেন প্রতিনিয়ত। কর্মচারীদের মধ্যে জমে থাকা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে শুক্রবার। এইদিন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি সহ রাজ্যের প্রতিটি জেলায় রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ডাকে বিক্ষোভ দেখান কর্মচারীরা। সহকর্মীর অকাল মৃত্যুতে শোকাহত কর্মচারীরা কালো ব্যাজ পরিধান করে বিক্ষোভ সভায় অংশ নেন। সভাগুলিতে দাবি ওঠে কর্মচারীদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া অমানুষিক কাজের বোঝা হ্রাস করতে হবে এবং কর্মচারীদের ন্যায্য চাহিদাগুলিকে বিচারের ক্ষেত্রে প্রশাসনকে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে হবে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিংহ জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার তারণ কুমার পতির দুঃখজনক মৃত্যুর ঘটনায় গভীর শোকজ্ঞাপন করেন এবং আধিকারিকের অমানবিক আচরণের প্রতি তীব্র ধিক্কার জানান। পাশাপাশি সমগ্র রাজ্যজুড়েই প্রশাসনের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক পরিবেশকে ধ্বংস করে গত দশ বছর ধরে আমলাতান্ত্রিক স্বৈরাচারের বুলডোজার যেভাবে চালানো হচ্ছে, তার তীব্র নিন্দা করেন। তিনি তারণ পতির স্ত্রী, দুই সন্তান সহ তাঁর পরিবার পরিজনকে সমবেদনা জানান।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাজ্য প্রশাসনে লক্ষাধিক পদ দীর্ঘদিন ধরেই শূন্য রয়েছে। প্রতি বছর বহু কর্মচারী অবসর গ্রহণ করছেন। স্বভাবতই স্থায়ী কর্মচারীর সংখ্যা ক্রমশ কমছে। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে যে সুষ্ঠু নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু ছিল, তা ২০১১ সালের পর থেকেই মুখ থুবড়ে পড়েছে। সামান্য ভাতার বিনিময়ে কিছু চুক্তি কর্মী নিয়োগ করে প্রশাসনকে সচল রাখার চেষ্টা হচ্ছে। এই চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের কোনো সামাজিক সুরক্ষা নেই। স্থায়ী কর্মচারীদের আর্থিক দাবি, অর্জিত অধিকার ও মর্যাদাকে ধুলিসাৎ করে সামন্ততান্ত্রিক কায়দায় পরিচালিত হচ্ছে প্রশাসন। দুয়ারে সরকার, লক্ষ্মীভাণ্ডারের মতো কর্মসূচী রূপায়ণের দায় চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে মুষ্টিমেয় স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মচারীদের ওপর। দিনে ৮ ঘণ্টার পরিবর্তে ১০ থেকে ১২ ঘণ্টা কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে কর্মচারীদের। শনিবার বা রবিবারের মতো সরকারী অফিসের ছুটির দিনেও অফিসে উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। বহু কর্মচারীর শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর তো বটেই, এমনকি পারিবারিক জীবনেও এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে।

ন্যায্য ছুটি না মঞ্জুরের মতোই, অন্যায় বদলির অস্ত্রকে ব্যবহার করেও কর্মচারীদের ভীতসন্ত্রস্ত করা হচ্ছে। কিছুদিন আগেই যার শিকার হয়ে আত্মহত্যা করেছেন এক চিকিৎসক। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে সম্প্রতি আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত প্রশাসনের সর্বস্তরে ডেপুটেশনের যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল, তার অন্যতম দুটি দাবি ছিল—নীতিহীন প্রতিহিংসাপরায়ণ বদলির আদেশনামা প্রত্যাহার এবং সমস্ত শূন্যপদে স্থায়ী নিয়োগ। রাজ্য সরকারের দিক থেকে কোনো ইতিবাচক সাড়া না পেলে, আগামী দিনে আরও বৃহত্তর লড়াইয়ের পথে এগোবে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। আগামী সোমবারও প্রশাসনিক উৎপীড়নে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারের মৃত্যুর প্রতিবাদে বিক্ষোভ হবে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। □

যুক্তিহীনতার জয়

বিজয় প্রসাদ

বিগত একশো বছর ধরে আফগানবাসী তাঁদের সমাজ সম্পর্কিত দুটি দর্শনের লড়াইয়ের মধ্যে জড়িয়ে রয়েছেন—এর মধ্যে একটি হল, যাঁরা মনে করেন নারী মুক্তি ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের মাধ্যমে সমাজের সংস্কার প্রয়োজন এবং অপরপক্ষ যাঁরা অতীতের মধ্যেই ভবিষ্যৎকে খোঁজার চেষ্টা করেন এবং সমাজ জীবনে চূড়ান্ত রক্ষণশীলতার ওপর জোর দেন। তালিবানরা হল এই দ্বিতীয় পথের মূর্ত প্রতীক।

১৯১১ সালের অক্টোবর মাসে মাহমুদ বেগ তারজি (১৮৬৫-১৯৩৩) কাবুলে মিরাজ-আল-আখবর (সংবাদের প্রদীপ) নামে একটি ঝকঝকে সাময়িক পত্রিকার প্রকাশনা শুরু করেন। সম্ভ্রান্ত বংশজাত তারজি, অটোমাব সাম্রাজ্যে নির্বাসিত অবস্থায় বড় হন এবং সেখানেই তিনি মহান বুদ্ধিজীবী এবং পর্যটক জামাল আদ দিন আল আফগানির (১৮৩৮-১৮৯৭) সংস্কার ভাবনাকে আত্মস্থ করেন। সাময়িক পত্রিকাটি রাজা হবিবুল্লাহর সংস্কার নীতিকে, যা অংশত আফগানিস্তানের ওপর ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রন (১৮৭৮-১৮৮০ দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধের পরবর্তী পর্বে) দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল এবং তাছাড়াও ছিল ইস্তাম্বুলে আধুনিকতার চর্চা, যা তারজি নিজেই উপলব্ধি করেছিলেন, প্রচারের আলোয় নিয়ে এসেছিল। তারজি যে বিষয়টির ওপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন, তা হল, সংস্কার প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে নারী শিক্ষার বিষয়টিকে না রাখলে কোনো সমাজের অগ্রগতি সম্ভব নয়। তাঁর সাময়িকীতে, আসমা রাসমিয়া খানুম, যিনি ১৮৭৭ সালে দামাস্কাসে জন্মগ্রহণ করেন ও অটোমান সাম্রাজ্যের 'তানজিমাৎ' সংস্কার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এবং তারজির সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন, তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের খ্যাতনামা ও প্রতিষ্ঠিত নারীদের সম্পর্কে একটি ধারাবাহিক রচনা লেখেন। ১৯২১ সালে তিনি ইরশাদ আল-নিশওয়ান নামে একটি সংবাদপত্রের সম্পাদনা শুরু করেন, যা ১৯২৫ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল।

তাঁদের কন্যা সোরাইয়া তারজি রাজা আমাবুল্লাহ খানকে বিবাহ করেন, যিনি ১৯১৯ সালে পিতার সিংহাসনে আসীন হন। ১৯২১ সালে আসমা রাসমিয়া বিদ্যালয় মাক্‌তব-ই-মাস্‌তুরাৎ প্রতিষ্ঠা করেন।

তারজি এবং আসমা রাসমিয়া খানুমের অনুপ্রেরণায় সংস্কার প্রক্রিয়ার, যা তাঁর বাবার হাত ধরে ধীরে ধীরে শুরু হয়েছিল, গতি বৃদ্ধি করেন। ১৯২৮ সালে আমানুল্লার এক বোন রাজকুমারি কোবরা নারী সুরক্ষার জন্য একটি সংস্থা গড়ে তোলেন (আনজুমান-ই-হিমায়াৎ-ই-নিশওয়ান), অপর বোন রাজকুমারী সিরাজ আল-বানাৎ ১৯২৪ সাল থেকে কাবুলে নারীদের হাসপাতাল পরিচালনা করেন।

এই সংস্কার প্রক্রিয়াগুলি মূলত তাঁদের ঘনিষ্ঠবৃত্তে থাকা সম্ভ্রান্ত পরিবার ও রাষ্ট্রীয় আধিকারিকদের প্রভাবিত করেছিল। একসাথে প্রায় ৮০০ ছাত্রী ঐ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করতো। এতদ্‌সত্ত্বেও তারজির উদ্যোগে পরিচালিত সংস্কার প্রক্রিয়া সমাজের অধিক রক্ষণশীল অংশকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। উদাহরণস্বরূপ, ১৯১৩ সালে মুফতি মহম্মদ রফিক এক পত্রের মাধ্যমে তারজির কাছে জানতে চান যে, সে কেন উন্নয়নের স্বাক্ষর হিসেবে পুরুষ ও যন্ত্রের ওপর মনোনিবেশ না করে নারীদের ওপর মনোনিবেশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন? তারজি জবাব দিয়েছিলেন, "বর্তমান সময়ে এমন কোনো সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্রিকা নেই, যেখানে নারীদের ভূমিকা সম্পর্কে কোনো কথা লেখা হয় না। ইউরোপীয় পত্রিকা ছাড়াও তুরস্ক, আরব এবং ভারতের পত্র-পত্রিকাতেও নারীদের অধিকার সংক্রান্ত বিতর্কের প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।" তারজির দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আমানুল্লা খান একগুচ্ছ নীতি যা বর্তমান সময় পর্যন্ত আফগান সমাজের অবনমন ঘটিয়েছে, সে সম্পর্কে বিতর্কের অবতারণা করেন। তিনি বাল্য বিবাহ রদ (সম্পত্তির বয়স নির্ধারিত হয় ১৩ বছর), বহু বিবাহ নিষিদ্ধ, বিধবা বিবাহের অনুমোদন, পর্দা প্রথার অবসান এবং পণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত একগুচ্ছ নিজামনামাহ্‌ (ডিক্রি) জারি করেন।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল, রাজা আমানুল্লাহ ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয় ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধে ব্রিটিশদের পরাজিত করেন। এই যুদ্ধের পরবর্তী প্রতিক্রিয়ায় ব্রিটিশ শক্তি আমানুল্লাহ শাসনকে বিভিন্নভাবে পর্যদুস্ত করার জন্য প্রচুর শক্তি ক্ষয় করে। ১৯২৭-২৮ আমানুল্লাহ এবং রানী সোরাইয়া ইউরোপ ভ্রমণের সময় বিভিন্ন ধরনের মানুষের মুখোমুখি হন। এই ভ্রমণের সময় বোরখাহীন সোরাইয়ার একটি ছবি প্রকাশিত হয়েছিল, যেখানে দেখা যাচ্ছে যে, তিনি তাঁর স্বামী ছাড়াও অন্যান্য পুরুষদের সাথে একটি নৈশভোজের আসরে উপস্থিত এবং ফরাসি রাষ্ট্রপতি গ্যান্টন ডোমার্গ তাঁর হাত চুম্বন করছেন। ব্রিটিশ গুপ্তচর বিভাগ এই ছবিটি আফগানিস্তানের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে দেয়, যা আমানুল্লাহর মৌলিক সংস্কারমূলক কার্যক্রমে অসন্তুষ্ট রক্ষণশীল অংশকে ইন্ধান যোগায়। আমানুল্লাহকে ক্ষমতাচ্যুত করে শাসন ক্ষমতা দখলের জন্য ঐ রক্ষণশীল অংশের সমর্থনপুষ্ট এক সেনাপতি হবিবুল্লাহ কলাকানি (অথবা বাচা-ই-সাকাও) কাবুল অভিমুখে রওনা হন। কলাকানি রাজাকে 'কাফির' (নাস্তিক) বলে সম্বোধন করেন, বালিকা বিদ্যালয়গুলি বন্ধ করে দেন, পর্দা প্রথা ফিরিয়ে আনেন এবং আমানুল্লাহর অন্যান্য মৌলিক সংস্কার মূলক পদক্ষেপগুলি বাতিল করে দেন।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত, আফগানিস্তানে সংস্কার ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংঘর্ষ চলছে, যেখানে পরেরটিকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কার্যকরীভাবে ব্যবহার করেছে ঐ দেশের সার্বভৌমত্বকে দুর্বল করার জন্য। দুর্বল আফগানিস্তানকে ব্রিটিশরা সোভিয়েত বিরোধী অগ্রবর্তী ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছিল। তারজি এবং আসমা রাসমিয়া খানুম যা করেছিলেন, তা অন্য দেশের মানুষকে বিস্মিত করার মতো কিছু নয়, কারণ তাঁদের প্রস্তাবিত সংস্কার প্রক্রিয়া—যার অনেকগুলি প্রথমে হবিবুল্লাহ ও পরে আমানুল্লাহ গ্রহণ করেছিলেন—ছিল আধিক্যহীন। কিন্তু এই সংস্কারগুলিই আফগান সমাজের অধিক রক্ষণশীল অংশকে ক্ষুব্ধ করে তোলে এবং তাঁরা আফগানিস্তানের সামাজিক অগ্রগতিকে ঠেকানোর জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে মিত্র হিসেবে গ্রহণ করেন।

কিন্তু আমানুল্লাহর পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে কাহিনীর শেষ হয়নি। আরও দুটি পর্ব থেকে গেছে। একটি ১৯৫৩ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত সংস্কারের দীর্ঘ পর্ব এবং অপরটি ১৯৯২ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রতিক্রিয়ার অন্ধকার পর্ব। এই পর্বে আর ব্রিটিশরা প্রধান বহিঃশক্তির ভূমিকায় থাকল না। এই ভূমিকায় এখন চলে এল সৌদি আরবের সম্পূর্ণ সমর্থনপুষ্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

লিঙ্গ সাম্য এবং সাক্ষরতা

আফগানিস্তানের চারটি সংবিধান ছিল (১৯২৩, ১৯৬৪, ১৯৭৬ এবং ১৯৮৭) যেগুলিতে পুরুষ ও নারীর সমতার কথা বলা হয়েছিল এবং বহুধা বিস্তৃত সামাজিক সংস্কারের পথ খুলে দেওয়া হয়েছিল। এই সংবিধানগুলি ছিল একদিকে তারজির ন্যায় অভিজাত অংশের প্রভাবিত সংস্কার প্রক্রিয়া এবং অপরদিকে কমিউনিস্ট এবং নারী সংগঠনগুলির তৃণমূলস্তরে লড়াইয়ের যৌথ ফসল। উভয়দিক থেকেই, ১৯৭৯ সালে যে জনসংখ্যার বিশ শতাংশের নিচে ছিল সাক্ষরতার হার, সেখানে সাক্ষরতা প্রসারের কর্মসূচী নিয়ে এগোনো হয়। উদারবাদী অভিজাতদের (যেমন প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ দাউদ) নীতি এবং কমিউনিস্টদের (যেমন অনাহিতা রেজ্জার্ড) নীতির মধ্যে পার্থক্য ছিল খুবই সামান্য, কারণ উভয়েই এই দশকগুলি জুড়ে সাক্ষরতা ও শিক্ষার প্রসার, জনসাধারণের জীবনের মান উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের লক্ষ্যে কাজ করেছেন। গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী আফগানিস্তানের সমাজ বিষয় দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবে অনাহিতা রাজ্জাডার জারি করা ডিক্রিই প্রতিফলিত হয়েছিল ১৯৭৭ সালে রাষ্ট্রপতি দাউদ প্রণীত দেওয়ানি আইনে। উদাহরণস্বরূপ, অনাহিতা রাজ্জাডার ৭নং ডিক্রিতে পণ এবং বিবাহ ব্যয়ের নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়েছিল, যা তার আগেই আমানুল্লাহ কান এবং পরবর্তীতে দাউদ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। অনাহিতা রাজ্জাডা কমিউনিস্ট হওয়া সত্ত্বেও এই সংস্কারগুলির মধ্যে সুনির্দিষ্ট কমিউনিস্টসুলভ কিছু ছিল না।

আমানুল্লাহ এবং দাউদের সাথে রাজ্জাডার মতো কমিউনিস্টদের পার্থক্য ছিল এখানেই যে, কমিউনিস্টরা জনসাধারণের সাক্ষরতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। অনাহিতা রাজ্জাড ছিলেন চারজন মহিলার মধ্যে অন্যতম। যাঁরা ১৯৬৫ সালে মহা আইন সভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন (বাকিরা হলেন, হেরাতের খাদিজা অহরারি, কন্দহরের মাসুমা এসামতি ওয়ার্দাক, কাবুলের রোকিয়া আবুবকর)। আফগান নারীদের গণতান্ত্রিক সংগঠনের (ডি ও এ ডব্লু, ১৯৬৫ সালে স্থাপিত) প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তিনি দাউদকে ১৯৭৬ সালের সংবিধান এবং ১৯৭৭ সালের দেওয়ানি আইন প্রণয়নে বাধ্য করার জন্য গণআন্দোলন গড়ে তুলতে আত্মনিয়োগ করেন। দেওয়ানি আইনের ২৭নং ধারায় বলা হয়েছিল, "আফগানিস্তানের সমস্ত জনগণ, নারী ও পুরুষ উভয়েই, বৈষম্য ও বিশেষ সুবিধা ব্যতিরেকে আইনের চোখে সম অধিকার ও সমান দায়বদ্ধতা ভোগ করবে।" এটি ছিল একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি, যাকে ১৯৭৮ সালের এপ্রিল মাসে ক্ষমতা দখলের পর কমিউনিস্টরা আরও দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছিল। ১৯৭৮ সালের দ্বিতীয়ার্ধে ডি ও এ ডব্লু এবং অন্যান্য গণসংগঠনগুলি রাষ্ট্র কাঠামোর সাথে সহযোগিতার ভিত্তিতে দেশে একটি দৃষ্টান্তমূলক সাক্ষরতা কর্মসূচী শুরু করে।

১৯৭৮ সালে কমিউনিস্টরা যখন ক্ষমতা দখল করে, তখন দেশে সাক্ষরতার হার ছিল মাত্র ১৮.৬ শতাংশ (নারীদের মধ্যে এই হার ছিল নগণ্য)। দ্রুত সাক্ষরতার প্রসারের লক্ষ্যে ১৮,০০০ প্রশিক্ষক গ্রাম ও শহরাঞ্চলে যান, কারণ এটিকেই যে কোনো সমাজ সংস্কারের ভিত্তি হিসেবে দেখা হয়েছিল। প্রতি বছর শত শত মহিলা কলেজ থেকে শিক্ষক, ডাক্তার, সরকারী আধিকারিক এবং অধ্যাপক হয়ে বেড়িয়ে আসতেন। তাঁরা কাবুলে গড়ে ওঠা আদর্শগত ধারণা নিয়ে গ্রামাঞ্চলে যেতে শুরু করেন, যেখানে তাঁরা সরাসরি উপজাতি গোষ্ঠীর প্রধান, জমিদার এবং যাজকদের প্রতিরোধের মুখোমুখি হন। গণ সাক্ষরতা এবং ভূমিসংস্কার কর্মসূচী সংক্রান্ত প্রচারকে রক্ষণশীল অংশ—যেমন জমিদার ও যাজক—সমাজের ওপর তাঁদের নিয়ন্ত্রণকে দুর্বল করার পরিকল্পনা বলেই মনে করত। তাই একে যে কোনো উপায়ে বন্ধ করার প্রয়োজন ছিল।

প্রতি-সংস্কারের যুগ ঃ

১৯১৯ সাল থেকেই সংস্কারকরা ভূ-স্বামী, বহু উপজাতি গোষ্ঠীর প্রধান এবং অধিকাংশ যাজকের প্রবল বাধার সম্মুখীন হন। এমনকি রাজারাও প্রথমে ব্রিটিশ ও পরবর্তীতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট এই গোষ্ঠীর জিঘাংসা থেকে রক্ষা পাননি। ১৯২৯ সালে রাজা আমানুল্লাহকে তাঁর সংস্কার প্রক্রিয়ার জন্যই সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। এবং ১৯৩৩ সালে রাজা নাদের শাহকে একই কারণে হত্যা করা হয়। সংস্কারের ঢেউ আফগান সমাজকে আলোড়িত করার ফলে, রক্ষণশীল এবং বুর্‌হানুদ্দীন রাব্বানির (যিনি কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐসলামিক ধর্মতত্ত্ব পড়াতেন) নেতৃত্বে তাদের শক্তি সংহত করে এবং ১৯৭২ সালে জামিয়াত-ই-ইসলামি গঠিত হয়। জামিয়াতদের প্রেরণা ছিল আবুল আ'লা মৌদুদির দর্শন এবং পাকিস্তানের জামাত-ই-ইসলামি। জামিয়াতরা সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে শুরু করার ফলেই, দাউদ রাব্বানিকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেন। কিন্তু রাব্বানি ১৯৭৩ সালে পাকিস্তানে গা ঢাকা দেয়। সে তার সাথে করে জামিয়াতদের একটা অংশকে নিয়ে গেছিল, যারা পাকিস্তান-আফগান সীমান্ত বরাবর গড়ে ওঠা উদ্বাস্তু শিবিরগুলিতে আশ্রয় নেয়। এখান থেকেই মার্কিন-সৌদি- পাকিস্তানের মদতপুষ্ট ১৯৮০-র দশকের মুজাহিদীন এবং ১৯৯০-র দশকের তালিবানদের আত্মপ্রকাশ।

রাব্বানির জামিয়াত একদিকে বহু বিবাহ ও বাল্য বিবাহের গুরুত্ব প্রচার শুরু করে, অপরদিকে নারী শিক্ষা এবং সমাজ জীবনে নারীদের ভূমিকাকে আক্রমণ করে। রাব্বানি গুলবুদ্দীন হেক্‌মতিয়ারের মতো কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র কর্মীদের তার আন্দোলনে টেনে আনে। হেক্‌মতিয়ার ১৯৬৯ সালে কাবুলে ছাত্রীদের মুখের ওপর অ্যাসিড ছুঁড়ে নাম কামিয়েছিল। দু'দশক পরে তার অনুগামীরা আবারও শিক্ষিকা এবং পেশোয়ারের উদ্বাস্তু শিবিরের সহায়িকাদের মুখের ওপর অ্যাসিড ছুঁড়বে। এরা ঘৃণ্য চরিত্রের লোক, যারা প্রত্যেকে শতাব্দী ব্যাপী আফগান সমাজ সংস্কারের চূড়ান্ত বিরোধী। হেক্‌মতিয়ার এখন কাবুলে এবং তালিবান নিয়ন্ত্রিত সরকারে তার স্থান প্রায় পাকা।

মার্কিনীদের সম্পূর্ণ সহায়তায় মুজাহিদীনরা পাকিস্তানে উদ্বাস্তু শিবির পরিচালনা করত। এই শিবিরগুলিতে ১৯৮৬ সালে সমীক্ষা করে দেখা গেছে, ৫ থেকে ১১ বছর বয়সের বালিকাদের মাত্র ৫ শতাংশ এবং ১২ থেকে ১৭ বয়সের কিশোরীদের ১.৪ শতাংশ স্কুলে গেছে।

১৯৯০ সালে পেশোয়ারে ২০০ জন আফগান ধর্মগুরু একটি ডিক্রিতে স্বাক্ষর করে নারী শিক্ষাকে নিষিদ্ধ করে। তারা লেখে, "নারী ও বালিকাদের শিক্ষালাভের এটি সঠিক সময় নয়। ১৯৯৩ সালে ইসলামিক রাষ্ট্র আফগানিস্তানের সর্বোচ্চ বিচারালয়ের গবেষণা ও নির্দেশিকা সংক্রান্ত দপ্তর---মুজাহিদিনদের সরকার—ঘোষণা করে "নারীদের বাড়ির বাইরে বেরনোর কোনো প্রয়োজন নেই।" নির্দেশিকায় আরও বলা হয়, "বিদ্যালয় হল বেশ্যালয় এবং ব্যভিচার ও অবাধ যৌন সংসর্গের কেন্দ্র।" তালিবানরা ক্ষমতায় আসার আগেই এটাই ছিল পরিস্থিতি। এরা ছিল মার্কিন মদতপুষ্ট মুজাহিদিন, যারা পরবর্তী পর্বে ২০০১ সালে উত্তরের জোট হিসেবে পুনর্গঠিত হয়।

১৯৯০ সালের মার্চ মাসে আফগান মহিলাদের ইস্‌লামিক সংগঠনের সভানেত্রী ফতিমা ইয়াসির, অবাহিতা রাজ্জাডের ঠিক বিপরীত মেরুর। পেশোয়ারে ইসলামিক আফগানিস্তানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত একটি সম্মেলনে বলেন, "ইসলামিক আইনকে পুরোপুরি অনুসরণ করলে, তবেই মেয়েরা বাইরে বেরোতে পারবে। যেমন বোরখা পরিধান এবং শুধুমাত্র নারীদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব (সন্তান মানুষ করা, বুনন, এমব্রয়ডারি ইত্যাদি) পালন। এমনকি তার এই বক্তব্য তার সমপদমর্যাদার পুরুষরা পরিত্যাগ করেছিল। কারণ তারা ন্যূনতম সংস্কারও মানবে না।

একশো বছর ধরে আফগানবাসী তাদের সমাজ সংক্রান্ত দুটি দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বন্দ্বের মধ্যে সংঘর্ষ করে চলেছেন—এর একটি সমাজ সংস্কারের নিদারুণ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এবং ভূমি সংস্কার, সাক্ষরতা প্রসার, নারী মুক্তি ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের উন্নয়ন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সকলের কল্যাণের কথা বলে। অপরটি অতীতের মধ্যে ভবিষ্যৎকে দেখতে চায় এবং সমাজ জীবনে সর্বাধিক রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গীর পক্ষপাতি।

তালিবানরা দ্বিতীয় পথের অন্ধ অনুগামী। এটি এমন একটি রক্ষণশীল পথ, যা ইস্তাম্বুল ও দামাস্কাস্‌ থেকে মাহমুদ বেগ তারজি এবং আম্‌মা রাসমিয়া খানুমের নিয়ে আসা এবং তাকে অনাহিতা রাজ্জডা কর্তৃক কাবুলে পরিশোধিত করা কোনো বিষয়কেই সহ্য করে না। ☐

(অনুবাদ ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সৌজন্যে ঃ ফ্রন্টলাইন
পত্রিকা, সেপ্টেম্বর, ১০, ২০২১)

বিধান পরিষদ আসলে ধান্দাবাজির ব্যবস্থা —একে রুখতে হবে

উৎসর্গ মিত্র

১৯৬৭ সালে দেশে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের ধারা বেয়ে এ রাজ্যেও কংগ্রেস পরাজিত হল। রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হল চোদ্দ দলের যুক্তফ্রন্ট সরকার অজয় মুখার্জীকে মুখ্যমন্ত্রী করে। উপ-মুখ্যমন্ত্রী হলেন জ্যোতি বসু। স্বাধীনতার পরে রাজ্যে এই প্রথম বিরোধী আসনে বসতে বাধ্য হল কংগ্রেস দল। ষড়যন্ত্র করে এ সরকারকে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছিল আট মাসের মাথায়। কুখ্যাত ধর্মবীর তখন এখানকার রাজ্যপাল। বলা বাহুল্য, কংগ্রেস দলের সাথে ষড়যন্ত্রে তিনিও পুরোমাত্রায় যুক্ত ছিলেন সরকার ভেঙ্গে দেওয়ায়। রাজ্যের আইন সভায় তখন দুই কক্ষ—নির্বাচিত কক্ষ বিধান সভা, যেখানে সিপিআইএম সহ বাম দলগুলির সংখ্যাধিক্য। আর স্থায়ী কক্ষ বিধান পরিষদ, যেখানে স্বাভাবিক ভাবেই কংগ্রেসের সংখ্যাধিক্য। যাই হোক, কোনও কিছুর তোয়াক্কা না করে রাজপাল রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষকে ফের মুখ্যমন্ত্রী বানিয়ে দিলেন। কংগ্রেস সমর্থন জানাল সেই সিদ্ধান্তের। মজার কথা, প্রফুল্লবাবু কিন্তু তখন কংগ্রেসের বিধায়ক নন, তিনি তখন নির্দল। তবু তিনিই হলেন মুখ্যমন্ত্রী। কারণ, বাম সংখ্যাধিক্যে সরকার চলবে, এটা মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না কংগ্রেসের পক্ষে তার শ্রেণী চরিত্রের কারণে।

উদগ্র বাসনার সাথে বাস্তবের মিল না থাকা সত্ত্বেও জোর করে কাজ করলে যা হয়, দেখা গেল রাজ্যের পরিস্থিতিও ঠিক তেমনটাই হয়েছে। বাম সংখ্যাধিক্যের বিধান সভায় স্পীকার রাজ্যপালের সিদ্ধান্তকে 'অসাংবিধানিক' আখ্যা দিয়ে নাকচ করে দিলেন কারণ সেখানে স-কংগ্রেস প্রফুল্লবাবু সংখ্যালঘু, অন্য দিকে বিধান পরিষদে কংগ্রেস সহজেই ঘোষ মন্ত্রীসভার পক্ষে সম্মতি আদায় করে নিল। দেখা গেল একই রাজ্যে দুটি আইন সভা সম্পূর্ণ বিপরীত দুই ধারায় চলতে শুরু করে দিয়েছে। সে এক অভূতপূর্ব সাংবিধানিক সঙ্কট, যার সমাধান কোথাও লেখা নেই। আবার রাজ্যপাল সহ কংগ্রেস দলও অনড়—কিছুতেই বামপন্থীদের সরকারে ফেরত আনা যাবে না! অবশেষে রাজ্যে জারি হল রাষ্ট্রপতির শাসন। সেও বকলমে কংগ্রেসেরই শাসন, তবু এর মধ্যে দিয়ে কাগজে-কলমে রাজ্যে দুই কক্ষের আপাত এবং অনভিপ্রেত সংঘাতের সমাধান হল, কিন্তু কংগ্রেস ছাড়া সব দলই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল যে, ভবিষ্যতে প্রথম সুযোগেই সংঘাতের এইরকম সমস্ত সম্ভাবনা উপড়ে ফেলতে হবে। এমন ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে, যেখানে মানুষের রায়ই চূড়ান্ত বলে গণ্য হয়।

উনসত্তরে ৩২ দফা কর্মসূচীর উপর দাঁড়িয়ে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে লড়ল এবং জিতল। এই ৩২ দফা কর্মসূচীর ৩১ নম্বরটি ছিল রাজ্যে বিধান পরিষদের অবলুপ্তির প্রতিশ্রুতি এবং সরকারে এসে ফ্রন্ট এই ৩১ নম্বরকে দিয়েই তার যাত্রা শুরু করল। অসহায় ভাবে তাকিয়ে দেখা ছাড়া কংগ্রেসের তখন আর কোনও উপায় নেই। যে সাংবিধানিক সঙ্কট মাত্র কিছুদিন আগে কংগ্রেসেরই বদান্যতায় রাজ্যে শুরু হয়েছিল, যে সাংবিধানিক সঙ্কট রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন ডেকে এনেছিল এবং যার ফলে রাজ্য নির্বাচনে দ্বিতীয় বার মুখ পুড়িয়েছিল কংগ্রেস দল, সেই সাংবিধানিক সঙ্কটের চির অবসানের উদ্যোগের বিরুদ্ধে কিছু বলারই মুখ তাদের আর ছিল না। একই কারণে কেন্দ্রের সরকারেরও এতে সিলমোহর দেওয়া ছাড়া কোনও গতি ছিল না। মার্চ, ১৯৬৯ থেকে রাজ্যে উঠে গেল বিধান পরিষদ। রাজ্যে তখনও রাজ্যপাল সেই ধর্মবীর। শোনা যায় যেদিন দেশের আইন সভা এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, সেদিন এই তিনিই নাকি বলেছিলেন, "বাঁচা গেল, সরকারের ব্যায়ভার এবার অনেকটা কমবে"! ডিসেম্বরে একই পথ ধরলো পাঞ্জাব, তার পর আরো এবং আরো... এই মুহূর্তে দেশে বিহার, উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা আর কর্ণাটক—মাত্র এই ছয়টা রাজ্যে বিধান পরিষদের অস্তিত্ব টিমটিম করে টিকে আছে।

সংবিধানের ১৬৯ নম্বর ধারা বলছে দেশের যে কোনও রাজ্যের বিধান সভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য যদি মত দেয়, তাহলেই সেই রাজ্যে বিধান পরিষদের সৃষ্টি বা অবলোপন ঘটানো যায়, তবে উভয় ক্ষেত্রেই দেশের আইন সভার অনুমোদন প্রয়োজন। সংবিধানের ভাষায়, "(1) Notwithstanding in Article 168, Parliament may by law provide for the abolition of the Legislative Council of a State having such a Council or for the creation of such a Council in a State having no such Council, if the Legislative Assembly of the State passes a resolution to that effect by a majority of the total membership of the Assembly and by a majority of not less than two-thirds of the members of the Assembly present and voting. (2) Any law referred to in clause (1) shall contain such provisions for the amendment of this Constitution as may be necessary to give effect to the provisions of the law and may also contain such supplemental, incidental and consequential provisions as Parliament may deem necessary (3) No such law as aforesaid shall be deemed to be an amendment of this Constitution for the purposes of Article 368."—অর্থাৎ সংবিধানে কোনও রাজ্যে বিধান পরিষদের সৃষ্টি বা বিলোপের জন্যে একটাই ধারা বরাদ্দ রয়েছে। কিন্তু এমন গোলমেলে ব্যাপার হয়ে রয়েছে কেন? এর উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের আরও কিছুটা পিছনে ফিরে যেতে হবে।

ভারতের শাসন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে ব্রিটিশ সরকার ভারত সচিব এডউইন মন্টেগু এবং ভাইসরয় ভিসকাউন্ট চেমসফোর্ডকে নিয়ে দুই সদস্যের যে কমিটি তৈরি করে, সেই কমিটি তাদের রিপোর্ট জমা দেয় ১৯১৭ সালে, যা 'মন্টেগু চেমসফোর্ড রিপোর্ট' নামে পরিচিত। ১৯১৯ সালে এর ওপর ভিত্তি করেই রচিত হয় 'গভর্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট, ১৯১৯' বিল এবং ওই বছরেরই ২৩ ডিসেম্বর ব্রিটিশ সরকার তাদের সিলমোহর দিয়ে এটিকে আইনে রূপান্তরিত করে। আরও অনেকগুলি বিষয়ের সঙ্গে এতে বলা ছিল ভারতের আইন সভায় ইংলণ্ডের মতোই দ্বি-কক্ষ ব্যবস্থার প্রবর্তনের কথা এবং সেই মোতাবেকই ১৯২১ সাল থেকে এ দেশে কেন্দ্রীয় আইন সভা ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলকে ভেঙে দুই কামরার আইন সভা চালু হয়ে যায়—একটার নাম হয় 'লেজিসলেটিভ অ্যাসেমব্লি', নিম্ন কক্ষ, প্রায় সবাই সরাসরি নির্বাচিত এবং জনগণের প্রশ্নের সামনে দায়বদ্ধ, যার মেয়াদ তিন বছর (এটি এখন 'লোক সভা' নামে পরিচিত, মেয়াদ পাঁচ বছর) আর অন্যটির নাম হয় কাউন্সিল অফ স্টেটস, উচ্চ কক্ষ, অর্ধাংশ সরাসরি নির্বাচিত, মেয়াদ পাঁচ বছর (এটি এখন 'রাজ্য সভা' নামে পরিচিত, মেয়াদ একই)। আইনে আরও বলা হয় যে এই নতুন ব্যবস্থার ফলাফল খতিয়ে দেখতে বাধ্যতামূলক ভাবে দশ বছর বাদে একটি কমিশন গঠন করতে হবে এবং সেই কমিশনের সুপারিশের ওপর নির্ভর করে পরবর্তী কার্যক্রম নির্ধারিত হবে। এরই সূত্র ধরে ১৯২৭ সালে গঠিত হয় সাইমন কমিশন। ভারতে চরম বিরোধিতার সম্মুখীন হয় এই কমিশন কারণ ভারতের আগামী ভাগ্য নির্ধারক এই কমিশনের সমস্ত সদস্যই ছিল শ্বেতাঙ্গ। নেহরু-গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের একটা বড়ো অংশ এই কমিশনকে বয়কটের ডাক দেয়। জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লীগও একে বয়কট করে। প্রতিবাদ করতে গিয়ে লালা লাজপত রায় পুলিশের লাঠির আঘাতে শহীদ হন। কিন্তু এত কিছুর মধ্যেও একে সমর্থন জানায় হিন্দু মহাসভা। আর একে সমর্থন জানান ডক্টর বি আর আম্বেদকর এবং পেরিয়ার ভি রামস্বামী। প্রথম জন পরে দায়িত্ব পেয়েছিলেন ভারতের সংবিধান রচনার এবং পরের জন তামিলনাড়ুতে স্থাপন করেছিলেন ডি এম কে দলের। সাইমন কমিশনের সুপারিশ মেনেই রচিত হয় ভারতের স্বাধীনতা আইন বা গভর্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট, ১৯৩৫। সাইমন কমিশনের সুপারিশ মেনেই ১৯৩৭ সালে রাজ্যে রাজ্যে নির্বাচন শুরু হয় এবং সাইমন কমিশনের মতামতকে মাথায় রেখেই বিভিন্ন রাজ্যে চালু হয়ে যায় দুই কামরার আইন সভা।

স্বাভাবিক ভাবেই সাইমন কমিশনের সমর্থক আম্বেদকর যখন স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনায় হাত দিয়েছিলেন, তখন কমিশনের প্রভাব তাঁর মধ্যে পুরোপুরি কাজ করছিল। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে ভারতের সংবিধানের একটা বড়ো অংশ ব্রিটেন, আমেরিকা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান থেকে হুবহু টোকা এবং বারে বারে যে যে কারণে এই সংবিধানকে সংশোধন করতে হয়েছে, তার মধ্যে এই কারণটি অন্যতম। সংবিধানের জন্যে ব্রিটেনের অংশ টোকার সময়ে আম্বেদকর গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট, ১৯১৯ এবং তারই সূত্র ধরে গঠিত সাইমন কমিশনের বেশ কিছু সুপারিশও ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন এই কথা ভেবে যে এতে ভারতের জনপ্রতিনিধিত্বের সুবিধাই হবে এবং ভারতের উচ্চ শ্রেণির মানুষ জন, যাঁরা সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন না, তাঁরাও দেশের আইন ব্যবস্থায় যুক্ত হতে পারবেন। তাঁর সুপারিশে এই সংক্রান্ত ধারাটি ছিল ১৪৮(ক) নম্বরে, পরবর্তী কালে বিভিন্ন সংশোধন, সংযোজনের ফলে তার জায়গা হয়েছে ১৬৯ নম্বরে। যেহেতু 'গভর্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট, ১৯১৯' শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় স্তরেই দুই কামরার আইন সভার কথা বলেছিল আবার ঐ অ্যাক্টেরই সুপারিশে গঠিত সাইমন কমিশন কেন্দ্রীয় স্তর থেকে সে ব্যবস্থা তুলে দিয়ে প্রয়োজনে রাজ্য স্তরে সে ব্যবস্থা চালু করার কথা বলেছিল, কিন্তু সুস্পষ্ট কোনও নির্দেশ দিয়েছিল না, সেইহেতুই সম্ভবত আম্বেদকর দুটো স্তরেই এই ব্যবস্থা চালু রাখার কথা বলেছিলেন এবং রাজ্যস্তরের ক্ষেত্রে গঠন এবং অবলুপ্তি—এই দুটোর জন্যেই কোনওক্রমে একটি মাত্র ধারাই বরাদ্দ করে রেখেছিলেন এবং চালু রাখার কথা বলেও বিধান পরিষদের জন্যে আইনি ক্ষমতার বরাদ্দ রেখেছিলেন নামমাত্র, বারে বারে সংবিধানের সংশোধন হয়েছে বটে কিন্তু এই দিকে কারুরই আর নজর পড়েনি কারণ ঐতিহাসিক ভাবেই স্বাধীনতার পর যত দিন গেছে, ততই রাজ্যগুলি দুই কামরা আইন সভার থেকে একে একে পিছিয়ে এসেছে।

এটা ঠিক যে, সংবিধানে বিধান পরিষদের সুপারিশ করা হয়েছিল শাসন ব্যবস্থায় মূলতঃ দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের স্থান করে দেওয়ার জন্যে। বলা হয়েছিল রাজ্যের শাসন কার্যে 'ওয়াচ ডগ'এর কাজ করবে এই বিধান পরিষদ, ঠিক যে কাজ করে ব্রিটেনের 'হাউস অফ লর্ডস' কিম্বা আমেরিকার 'সিনেট', কিন্তু, যেহেতু ভারতীয় রাজনীতিবিদদের মানসিকতা ব্রিটেন এবং আমেরিকার থেকে ভিন্ন, সেহেতু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল বিধান পরিষদের ওয়াচ ডগের ব্যবস্থা আসলে শাসন ব্যবস্থায় এক অনাবশ্যক জটিলতার সৃষ্টি করছে এবং অনতিবিলম্বেই এই ব্যবস্থা আসলে বাতিল হয়ে যাওয়া রাজনীতিবিদদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। এমনিতেই বিধান পরিষদের আইনি ক্ষমতা খুব সীমিত, কাগজে কলমে যতই একে 'উচ্চ কক্ষ' বলে বর্ণনা করা হোক না কেন, কোনও বিল পাশ করার অধিকার এর নেই, যেটা রাজ্য সভার আছে। ওয়াচ ডগ'এর ভূমিকা কিভাবে এ পালন করবে, তা পরিষ্কার নয় কারণ নিম্ন কক্ষ বিধান সভার পাশ করা কোনও বিল বাতিলের ক্ষমতা এর নেই, শুধু মাত্র সেটিকে আইনে পরিণত করার প্রক্রিয়ায় এ মাত্র তিন মাস দেরি করিয়ে দিতে পারে—এই মাত্র! এমনকি যদি কোনও বিলে বিধান পরিষদ আপত্তিও জানায়, তাহলেও বিধানসভা রাজ্যপালের অনুমোদন নিয়ে তাকে আইনে পরিণত করে দিতে পারে। সুতরাং এর থাকা বা না থাকায় কিছু যায় আসে না কোনও রাজ্য প্রশাসনের, অথচ এর সদস্যদের বেতন, ভাতা ইত্যাদি সবই হবে হচ্ছে বিধানসভার সদস্যদের মতোই। তাহলে আজকের দিনে এই ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার বা নতুন করে কোথাও প্রবর্তনের দরকার কী?

এখানে বলতে কোনও দ্বিধা নেই যে একমাত্র অসাধু রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ ছাড়া এই ব্যবস্থার সমর্থক কেউ হতে পারে না, ইতিহাস বলছে এই ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে বারে বারে জনগণের রায়ে হেরে যাওয়া, বাতিল হয়ে যাওয়া ব্যক্তিবর্গ জোর করে ফের প্রশাসনের ভিতরে ঢুকে পড়েছে, প্রশাসন দখল করেছে কারণ এর সদস্যদের একটা বড়ো অংশের জন্যে নির্বাচনে জেতার কোনো প্রয়োজন পড়ে না, রাজ্যপালের মনোনয়ন'এর ভিত্তিতেই তাঁর ফের আইন সভার সদস্য হয়ে যেতে পারেন, এমনকি প্রশসনের প্রধান পর্যন্ত হয়ে যেতে পারেন। আর কে না জানে সাধারণতঃ রাজ্যপালেরা সরকারেরই কথায় চলাফেরা করেন। সুতরাং নিম্নকক্ষের সংখ্যা গরিষ্ঠ দল যদি মনে করে জোর করে হলেও তাদের কোনও নেতা বা নেত্রীকে প্রশাসনের ভিতরে ঢুকিয়ে দেবে, তাহলে দুই কক্ষ বিশিষ্ট কোনও রাজ্যে সেটা হয়ে দাঁড়ায় স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। এ ছাড়া পছন্দের লোকদের 'পাইয়ে দেওয়া'র ব্যবস্থাও তো করা যায় এই পদ্ধতির মাধ্যমে। ১৯৫৩ সালে মোরারজি দেশাই তৎকালীন বম্বে বিধানসভার নির্বাচনে হেরে গিয়েও রাজ্যপালের 'মনোনয়ন'এর মধ্যে দিয়ে দিব্যি মুখ্যমন্ত্রী হয়ে গিয়েছিলেন। একইরকম ভাবে চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারি মাদ্রাজে, জ্ঞানী গুরুমুখ সিং মুসাফির পাঞ্জাবে এবং বি পি মণ্ডল বিহারে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। জনগণের মতামতকে মান্যতা না দিয়ে ঘৃণ্য স্বার্থ সিদ্ধির ব্যবস্থা হল এই তথাকথিত 'উচ্চকক্ষ' বিধান পরিষদ।

কোনও বিল পাশ করাতে যেটুকু দেরি করিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা বিধান পরিষদের আছে, শয়তানি বুদ্ধি থাকলে তাই দিয়েও নির্বাচিত কোনও সরকারের কাজে যথেষ্ট ব্যাগড়া সৃষ্টি করা যায়, এটা অনস্বীকার্য, ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের কথা আগেই বলেছি। প্রায় সমসাময়িক ঘটনা ঘটেছিল পাঞ্জাব প্রদেশে। সেখানেও মূল চক্রী ছিল কংগ্রেস। সে সময়ে পাঞ্জাব বিধানসভায় আকালী দল নির্বাচনে

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

মাথা নোয়ানো নয়
প্রতিবাদ-প্রতিরোধের চেনা পথেই হাঁটব

বিজয় শংকর সিংহ

রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনী ফলাফলের পর রাজ্য আইন সভায় সংসদীয় গণতন্ত্রে এক নতুন উদ্বেগময় পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। গত দশ বছর যারা সরকার চালিয়েছে, তারাই আগামী পাঁচ বছর সরকার চালাবে। গত দশ বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতা যা হয়েছে, তাতে একথা বলা যায় আগামী পাঁচ বছরে প্রশাসনের অভ্যন্তরে দম বন্ধ করা নির্মম পরিবেশের মধ্যে আমাদের কাটাতে হবে। বিরোধী পক্ষ থাকবে চরম দক্ষিণপন্থী সাম্প্রদায়িক শক্তি। স্বাধীনতার পর বামপন্থী শূন্য আইন সভা। উদারনীতি ও সাম্প্রদায়িক বহুমাত্রিক বিভাজনের বিরুদ্ধে লড়াই আমাদের রাজ্যের আইন সভায় থাকছে না। এছাড়া বামপন্থীরা আইনসভায় শ্রমিক কর্মচারী তথা শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে ও দেশের ঐক্য ও সংহতি রক্ষায় যে লড়াই করত সেখানে তাদের কথা বলার সুযোগ থাকল না। এই কঠিন পরিস্থিতিতে আমাদের কথা শুধুমাত্র আমাদেরই বলতে হবে। ন্যায় দাবি আদায়ে আরও সোচ্চারে বলতে হবে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শক্তি ও আমরাও ইতিমধ্যে পথে নেমেছি। পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী কোভিড মহামারী সংক্রমণে আমাদের 'মানুষের পাশে মানুষের সাথে' থাকার সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে হবে।

দেশজুড়ে বিজেপি এবং এ রাজ্যে তৃণমূল যে আক্রমণ নামিয়ে হানছে, তার প্রতিবাদ-এর সঙ্গে প্রতিরোধও হবে। আর এস এস বিজেপি সারা দেশে আক্রমণ নামিয়ে এনেছে। ত্রিপুরায় বর্বর আক্রমণ এনে গণতন্ত্র ধ্বংস করছে। পশ্চিমবঙ্গেও শাসকদল গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রতিরোধ হচ্ছে। সারা দেশের সাথে ২৭ সেপ্টে, ২১-এ রাজ্যেও সাধারণ ধর্মঘট পালন করা হবে। পঞ্চায়েত পৌরসভা নির্বাচন করছে না। এখন পৌরসভা নির্বাচন না করে প্রশাসক বসিয়ে চালাচ্ছে। শাসকদলের নেতাদের পদ ও সুযোগ সুবিধা পাইয়ে

দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৫টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে একজন ব্যক্তির ইচ্ছাপূরণের জন্য বেছে নিয়ে মাত্র একটি কেন্দ্রে উপনির্বাচন করা হচ্ছে।

আমাদের দেশে ও রাজ্যে অর্থনৈতিক সঙ্কট আরো তীব্র হচ্ছে। গত আগস্ট মাসেই নতুন করে ১৫ লক্ষ মানুষ কর্মহীন হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বলছেন দেশ অর্থনীতিতে এগোচ্ছে, আর এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দাবি করছেন যে, এই মহামারী আর লকডাউনের মধ্যেই নাকি এ রাজ্যে ৪০ ভাগ বেকারি কমেছে। মিথ্যা নির্মাণের প্রতিযোগিতা চলছে। পেট্রোপণ্য সহ আকাশ ছোঁয়া দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি। কর্পোরেট নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া তাদের সঙ্গে তাল দিয়ে সেই মিথ্যা প্রমাণে সাহায্য করছে। বিশ্বের ও দেশের অর্থনীতিবিদরা বলছেন লগ্নীপুঁজির হাত ধরেই বিশ্বজুড়ে এমন সঙ্কট দেখা দিয়েছে যা গত দেড়শ বছরে উৎপাদন ক্ষেত্রে দেখা যায়নি। আমাদের দেশেও সঙ্কটে কৃষি ও শিল্প। রুটি রুজির ভয়াবহ সঙ্কটে শ্রমজীবী মানুষ। এই সঙ্কটের জন্য দায়ি শাসক দলের বিরুদ্ধে বামপন্থীদের নেতৃত্বে দেশজুড়ে আন্দোলনে সামিল হচ্ছে সাধারণ মানুষ।

কোভিড অতিমারি কাউকে রেয়াত করেনি, অতিমারি ধেয়ে গেছে সবার দিকেই। কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউ কিছুটা স্তিমিত, কিন্তু নয়া মিউট্যান্ট সমন্বিত তৃতীয় ঢেউয়ের আশঙ্কা বৃদ্ধি পাচ্ছে, এমনই এক সন্ধিক্ষণে কোভিড প্রোটোকলকে যথোপযুক্ত মান্যতা দিয়েও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ডাকে রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা, উত্তরে দার্জিলিং থেকে দক্ষিণে সুন্দরবন পর্যন্ত পথে নেমেছেন বা নামতে বাধ্য হয়েছেন। পাঁচ দফা কেন্দ্রীয় দাবির সাথে অঞ্চল ভিত্তিক বিভিন্ন দাবিকে যুক্ত করে আগস্ট মাসব্যাপী ব্লক, মহকুমা ও জেলাস্তরে ডেপুটেশন কর্মসূচী সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিটি ডেপুটেশন কর্মসূচীর শুরুতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় কর্মচারীদের জমায়েত করে সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থায়ী জনসাধারণের দাবি সহ কেন্দ্রীয় পাঁচ দফা দাবি সম্বলিত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

দাবি সনদে সন্নিবিষ্ট প্রতিটি দাবির বর্তমান সময়ে প্রাসঙ্গিকতা উপলব্ধি করেই রাজ্য কর্মচারীরা (অস্থায়ী বা চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী সহ) স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই কর্মসূচীগুলিতে অংশগ্রহণ করেন। পাঁচ দফা কেন্দ্রীয় দাবির প্রথম দাবিটি

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে

শ্রদ্ধায় স্মরণ মলয় রায়কে

পশ্চিমবাংলার রাজ্য সরকারী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান অগ্রণী সংগঠক, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ ডাইরেক্টরেট এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন যুগ্ম সম্পাদক ও সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের প্রাক্তন হেড কোয়ার্টার্স সেক্রেটারি প্রয়াত কমরেড মলয় রায়ের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয় গত ২ সেপ্টেম্বর (বৃহস্পতিবার), রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় দপ্তর কর্মচারী ভবনের 'অরবিন্দ সভাকক্ষে'। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ও পশ্চিমবঙ্গ ডাইরেক্টরেট এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশন যৌথভাবে এই স্মরণসভার আয়োজন করে।

সভার শুরুতে প্রয়াত কমরেড মলয় রায়ের প্রতিকৃতিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি আশিস ভট্টাচার্য, ডাইরেক্টরেট এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শাশ্বত বন্ধু মুখার্জি, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক তথা সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের সহ-সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিংহ, কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী, ডাইরেক্টরেট এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক নিখিল পাত্র, যুগ্ম-সম্পাদক শিলাদিত্য মোহরার। এছাড়াও তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান কো-অর্ডিনেশন কমিটির

মাল্যদান করছেন কমরেড মলয় রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র

প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক স্মরজিৎ রায়চৌধুরী, অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও মনোজকান্তি গুহ। শ্রদ্ধা জানান ডাইরেক্টরেট এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব মুখোপাধ্যায় ও অসিত ভট্টাচার্য, রাজ্য কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ

স্মৃতিচারণা করছেন বিজয় শংকর সিংহ

নেতা প্রণব চট্টোপাধ্যায়। তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানান পুত্র, পুত্রবধু ও পৌত্রী। এছাড়াও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সমিতির পক্ষ থেকে এবং তার সহকর্মী ও সহযোদ্ধারা তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

সভায় শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন আশিস ভট্টাচার্য। স্মৃতিচারণা করে বক্তব্য রাখেন নিখিল পাত্র, বিজয় শংকর সিংহ এবং তার পৌত্রী সোনারেখা রায়। নিখিল পাত্র এবং বিজয় শংকর সিংহ প্রয়াত নেতার কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক, এই রাজ্যে ও সর্বভারতীয় কর্মচারী আন্দোলনে তাঁর নেতৃত্বকারী ভূমিকা, তাঁর বিবিধ চারিত্রিক গুণাবলীর বিষয়ে তাঁদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ও স্মৃতিচারণায় উল্লেখ করেন। তাঁরা আরও বলেন, গত শতাব্দীর ষাটের দশকে চূড়ান্ত প্রতিকূল পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করে যে উত্তাল কর্মচারী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, সেখানে আরও অনেকের জন্যই কমরেড মলয় রায় উদাহরণযোগ্য সাহসিকতার পরিচয় রেখেছিলেন। তাঁর সুমধুর ব্যবহার সর্বস্তরের কর্মী সংগঠকদের মধ্যে তাঁকে বিপুল জনপ্রিয়তা প্রদান করেছিল। বর্তমান কঠিন পরিস্থিতিতে সংগঠন-আন্দোলন পরিচালনার প্রশ্নেও কমরেড মলয় রায়ের সংগ্রামী জীবন থেকে শিক্ষা নেওয়ার আহ্বান জানান উভয় বক্তাই। তাঁর পৌত্রী সোনারেখা পরিবারের অভিভাবক হিসেবে মলয় রায়কে যেভাবে দেখেছেন, পেয়েছেন তার স্মৃতিচারণা করেন। আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে স্মরণ সভার কাজ শেষ হয়। সভা পরিচালনা করে আশিস ভট্টাচার্য ও শাশ্বত বন্ধু মুখার্জিকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কমরেড মলয় রায় গত ২২ মে কোভিড জনিত অসুস্থতার কারণে ৮৪ বছর বয়সে প্রয়াত হন। □

গ্রন্থাগার উদ্বোধন

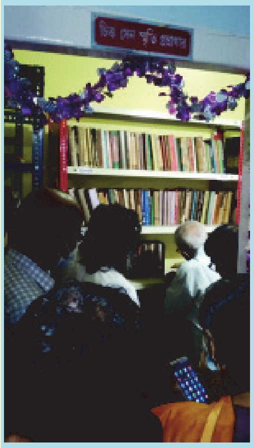

গত ৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ কর্মচারী সমিতির উদ্যোগে সমিতির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ও স্বাধীনতা উত্তর রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা নেতা কমরেড চিত্ত সেনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে কেন্দ্রীয় দপ্তর অরবিন্দ কেন্দ্রে কমরেড চিত্ত সেন স্মৃতি গ্রন্থাগার উদ্বোধন হল। সমিতি ও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন সরকারী কর্মচারী আন্দোলন বিকশিত করার ক্ষেত্রে কমরেড চিত্ত সেনের অবদান, ত্যাগ তিতিক্ষা ব্যাখ্যা করে বর্তমান পরিস্থিতি উত্তরণের লক্ষ্যে পঠন পাঠনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক অশোক প্রামাণিক। সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি অনুব্রত সেনগুপ্ত। অনুষ্ঠানে রাজ্য কে-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য প্রণব কর, কমরেড চিত্ত সেনের পুত্র শ্রী অর্ঘ সেন ও পুত্রবধূ শ্রীমতী আগমনী সেন উপস্থিত ছিলেন। □

শোক সংবাদ

সত্যগোপাল রায়

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পূর্বাঞ্চলের প্রাক্তন সম্পাদক ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতির কার্যকরী কমিটির সদস্য কমরেড সত্যগোপাল রায় ২১ সেপ্টেম্বর সকাল ৭.২০ মিনিটে প্রয়াত হয়েছেন। কমরেড রায়ের প্রয়াণে আমরা হারালাম একজন দায়িত্বশীল, নিষ্ঠাবান ও প্রতিবাদ এক সংগঠককে। শ্রমিক শ্রেণীর মতাদর্শের প্রতি ছিল তাঁর অবিচল আস্থা। সদা হাস্যময়, কর্মমুখর এই মানুষটির প্রয়াণে সংগঠন হারালো এক সহযোদ্ধাকে। তাঁর অমলিন স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। তাঁর পরিবার পরিজন ও অনুগামী সমাজকে জানাই সমবেদনা।

কমরেড সত্যগোপাল রায় লাল সেলাম
কমরেড সত্যগোপাল রায় অমর রহে

গোবিন্দ রায়

পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ভূমি সংস্কার কর্মচারী সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রাক্তন দপ্তর সম্পাদক কমরেড গোবিন্দ রায় গত ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখ সকাল ৮.১২ মিনিটে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ৬৪ বছর বয়সে মারা গেছেন। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী এবং ছোটো ভাইকে। আজীবন তিনি বামপন্থী মতাদর্শে অবিচল থেকে সংগঠনকে বিকশিত করার লক্ষ্যে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে গেছেন। কোনোদিন সাংগঠনিক কাজে অবহেলা তাঁকে করতে দেখা যায়নি সাংগঠনিক জীবনে। অসুস্থ শরীরেও তিনি চুঁচুড়াতে অনুষ্ঠিত ৪২তম রাজ্য সম্মেলনকে সফল করার লক্ষ্যে আমাদের উৎসাহ দিয়ে গেছেন।

তাঁর মৃত্যু আমরা হারালাব সংগঠনের এক প্রিয় নেতৃত্ব ও অভিভাবকে। তাঁর অমলিন স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। তাঁর পরিবার পরিজন ও অনুগামী সমাজকে জানাই সমবেদনা।

কমরেড গোবিন্দ রায় লাল সেলাম
কমরেড গোবিন্দ রায় অমর রহে

চতুর্থ পৃষ্ঠার পরে

বিধান পরিষদ আসলে ধান্দাবাজির ব্যবস্থা

মধ্যে দিয়ে সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করলেও বিধান পরিষদে সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে বসেছিল কংগ্রেস। ফলে প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে উচ্চকক্ষে বসে কংগ্রেস আকালী সরকারের সমস্ত বিলে শুধু ব্যাগড়াই দিয়ে গেছে সেই সময়ে। জনগণের কাজ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল তখন আকালী দলের পক্ষে। ফলে এক রকম বাধ্য হয়েই পাঞ্জাব বিধানসভা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পুরো বিধান পরিষদটাকেই তুলে দেওয়ার। উনসত্তরে কেন্দ্রে কংগ্রেস যথেষ্ট দুর্বল থাকায় পশ্চিমবঙ্গের মতোই পাঞ্জাবের ক্ষেত্রেও তারা বাধ্য হয়েছিল পাঞ্জাব বিধান সভার সিদ্ধান্তে সিলমোহর দিতে। এমনিতেই দেশে সরকারী কাজকর্ম যথেষ্ট ঢিমে তালে চলতে অভ্যস্ত। তার ওপর যদি শুধু মাত্র শয়তানির কারণে তাতে আরও দেরি করিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সাধারণ মানুষের কী হাল হয়, তা বলাই বাহুল্য। আজকের দিনে এই ব্যবস্থা শুধু অপ্রয়োজনীয়ই নয়, তা রীতিমতো ক্ষতিকরও বটে। একটা বিধান পরিষদ পুষতে গেলে যে হাতির খরচ নয়, পুরো হাতিশালের খরচ হয়, তা দিয়ে ইচ্ছে করলে জনগণের যে উন্নতি সাধন করা যায়, তা এক কথায় অপরিমেয়। যে যে কারণে রাজ্য সরকারগুলি বিধান পরিষদের থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করেছে, সেগুলির মধ্যে 'অপ্রয়োজনীয় আর্থিক বোঝার থেকে মুক্তি' অন্যতম। এখানে উল্লেখ্য যে, স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার জন্যে যাঁরা দায়িত্ব পেয়েছিলেন, তাঁরা নিজেরাও এই দুই কামরা ব্যবস্থার কার্যকারিতা সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দিহান ছিলেন, তাঁরা নিজেরাই সংবিধানে এর অবলোপনের ব্যবস্থা করে রাখতেন না। তাছাড়া আজকের ভারতে স্নাতক, ডাক্তার, কলাবিদ ইত্যাদির এতই ছড়াছড়ি যে, তাঁদের স্বীকৃতি দেওয়ার প্রয়োজনের তাগিদে বিধান পরিষদ টিকিয়ে রাখার যুক্তি ধোপে টেকে না। এর থেকে অনেক উপকার হয় তাঁদের, যদি তাঁদের কাজের উপযুক্ত ক্ষেত্র সরকারের পক্ষ থেকে তৈরি করে দেওয়া হয় এবং তাঁরাও সেটাই চান।

সুতরাং জনগণের কোনও ব্যাপার না, বিধান পরিষদ নিয়ে যাবতীয় প্রশ্ন এ দেশে শুধু রাজনৈতিক দলগুলারে সাথেই জড়িত, নানা ভাবে আখের গোছাতে চাওয়া যে সব রাজনীতিবিদ জনগণের স্বার্থ এবং অর্থের বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা করে না, তারাই শুধু এই ব্যবস্থার পক্ষে থাকে। গত বছরেই অন্ধ্রপ্রদেশ বিধানসভা সেখানকার বিধান পরিষদ উঠিয়ে দেওয়ার জন্যে কেন্দ্রের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছে। ১৯৫৮ সালে সেখানে বিধান পরিষদের প্রবর্তন হয়। ১৯৮৫ সালে এন টি রামা রাও মুখ্যমন্ত্রী হলে উদ্যোগ নিয়ে সে পরিষদের অবলুপ্তি ঘটানো হয়। কংগ্রেসের ওয়াই এস রাজশেখর রেড্ডি এসে পুনরায় সেই ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনেন। এখন আবার মুখ্যমন্ত্রী জগন্মোহন রেড্ডি সে ব্যবস্থা তুলে দিতে চাইছেন। কী বোঝা যাচ্ছে এর থেকে ? অন্ধ্রের সাধারণ মানুষ একবার চাইছেন বিধান পরিষদ আসুক, আর এক বার চাইছেন উঠে যাক? কখনই না! তামিলনাড়ুতে ১৯৮৬ সালে এ আই এ ডি এম কে প্রধান এম জি রামচন্দন ক্ষমতায় এসেই বিধান পরিষদ উঠিয়ে দিয়েছিলেন শুধু মাত্র ডি এম কে প্রধান করুণানিধি যাতে কোনোমতেই আইন সভায় প্রবেশ না করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে। তারপর থেকেই সেখানে বিধান পরিষদ নিয়ে এই দুই দলের টানাপোড়েন লেগেই আছে। সবটাই জনগণের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে? কখোনই না! রামচন্দন, করুণানিধি, রামা রাও, রাজশেখর রেড্ডি বা জগন্মোহনের রাজনৈতিক ওঠা-পড়া আমরা সবাই জানি। স্পষ্টতই পায়ের তলার জমি থাকলে সে মুখ্যমন্ত্রী আর বিধান পরিষদের পক্ষপাতি থাকছেন না এর অসুবিধাগুলির কারণে, কিন্তু যাঁর পায়ের তলার জমি নড়বড়ে হচ্ছে, তিনিই এর পক্ষপাতি হয়ে পড়ছেন।

এ রাজ্যে মমতা ব্যানার্জি ফের বিধান পরিষদ ফিরিয়ে আনার পক্ষে সওয়াল করেছেন শুধু নয়, সংখ্যাধিক্যের জোরে বিধানসভায় বিনা আলোচনায় শুধুমাত্র 'ধ্বনি ভোটে' এর পক্ষে প্রস্তাব পাশ পর্যন্ত করিয়ে নিয়েছেন। বর্তমানে রাজ্যের ভেঙ্গে পড়া আর্থিক পরিস্থিতিতে এই সিদ্ধান্ত যদি বাস্তবায়িত হয়, তাহলে এক কথায় সেটা হবে বিপর্যয়কর। এই মহামারীর বিপদের সময়ে সরকার মানুষকে ওষুধ, অক্সিজেন, চিকিৎসা পরিষেবা দিতে পারছে না। হাসপাতালে শয্যা ও পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করতে পারছে না, শিক্ষাব্যবস্থা বিপর্যস্ত, মানুষের রুটিরুজির ব্যবস্থা করতে সরকার ব্যর্থ, তবু তৃণমূল সরকার এই সব সমস্যার সমাধানকে অগ্রাধিকার দেওয়ার বদলে শাসকদলের কয়েকজনকে পিছনের দরজা দিয়ে পুনর্বাসন দিতে বিধান পরিষদ গঠনের নামে 'সাদা হাতি' পোষার ব্যবস্থা করতে চাইছে, কারণ গত বিধানসভা নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী সহ শাসকদলের এক ঝাঁক নেতা-নেত্রী পরাজিত হয়েছেন। রাজ্যবাসীর স্বার্থ এবং রাজ্যের বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রয়োজনীয়তাকে বিবেচনা না করেই এই সিদ্ধান্ত। ভারতের মতো বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশে আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত করতে জাতীয় স্তরে আইনসভার উচ্চকক্ষ বা রাজ্যসভা থাকার দরকার আছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যস্তরে আইনসভার উচ্চকক্ষের কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। প্রায় সব রাজ্যই বিধানসভায় প্রস্তাব নিয়ে বিধান পরিষদ তুলে দিয়েছে, কারণ কোথাওই বিধান পরিষদের কার্যকারিতাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। এ রাজ্যেও বিধান পরিষদের কার্যকরী ভূমিকা কোনও দিনই ছিল না। ১৯৫২ সাল থেকে পরবর্তী ১৭ বছরে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় ৪৩৬টি বিল পাস হয়েছিল, তার মধ্যে মাত্র দুটি বিল সংশোধিত হয়েছিল বিধান পরিষদের সুপারিশক্রমে। স্বাভাবিক ভাবেই এই 'সাদা হাতি' পোষার চেষ্টার বিরোধিতা করছে বাম দলগুলি। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ২০১১ সালেও একবার চেষ্টা করেছিলেন বিধান পরিষদ ফিরিয়ে আনার, কিন্তু তখন রাজ্য বিধানসভায় বাম প্রতিনিধিদের সংখ্যা ভালো মতো থাকায় তাঁরা যে যুক্তিপূর্ণ বিরোধিতা সেখানে উপস্থিত করতে পেরেছিলেন, তার সামনে পিছু হঠতে বাধ্য হতে হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু এখন পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে তিনি ফের ঝাঁপিয়ে পড়েছেন পরিষদ ফিরিয়ে আনতে। বিধানসভায় এখন বাম দলগুলির কোনও প্রতিনিধি না থাকায় কোনও বিরোধিতার মুখে এখন আর তাঁকে পড়তে হচ্ছে না, কারণ এখনকার এক মাত্র বিরাধেী দল বি জে পি ঐতিহাসিক ভাবেই জনগণের সুবিধা-অসুবিধার কথা বিবেচনায় আনে না।

প্রশ্ন হচ্ছে, পরপর বিপুল ভাবে তাঁর দল ভোটে জেতার পরেও মমতা ব্যানার্জী অযৌক্তিক বিধান পরিষদকে ফিরিয়ে আনার জন্যে এত মরিয়া কেন? খতিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে এর কারণ দুটো। প্রথমত, আপাতদৃষ্টিতে তাঁর দলের প্রার্থীদের জয় যতোই মসৃণ হোক না কেন, যোগ্য প্রার্থী কেউই নয়। বাম দলগুলির সাংগঠনিক দুর্বলতা এবং ঘুর পথে কেন্দ্রের শাসক দলের অপ্রকাশ্য মদত আর কর্পোরেট মালিকানাধীন মিডিয়ার ধুন্ধুমার প্রচারের জেরেই এই জয়গুলো আসছে। এই ফ্যাক্টরগুলির কোনও একটাও যদি এদিক ওদিক হয়ে যায়, তাহলে আর তাঁর দলের পক্ষে বিধানসভায় জিতে আসা সম্ভব না—সেটা তিনি ভালোমতোই জানেন। আবার এটাও তিনি ভালো করেই জানেন যে, তার দলের প্রমাণিত ধান্ধাবাজ নেতারা যদি ক্ষমতার অলিন্দ থেকে কখনও মরে যায়, তাহলে দল ধরে রাখাই তাঁর পক্ষে রীতিমতো অসম্ভব হয়ে পড়বে। সুতরাং হেরে গেলেও তাদের যাতে কোনও একটা ব্যবস্থা করা যায়, তার জন্যে বিধান পরিষদই তাঁর এক মাত্র রাস্তা, উপরন্তু এখন নিজে তিনি পরাজিত হয়েও আইনের বিশেষ ব্যবস্থা বলে মুখ্যমন্ত্রী হয়ে থাকতে পারছেন বটে, কিন্তু আইন অনুযায়ীই তাঁকে আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই কোনও না কোনও কেন্দ্র থেকে জিতে আসতে হবে। কোনও কারণে সেটা যদি সম্ভব না হয়, তখন অন্তত ঘুর পথেও যাতে ফের ক্ষমতায় বসতে পারেন, তার ব্যবস্থা করার তাগিদও তাঁর রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, রাজ্য বিধান সভায় মোট আসন এখন ২৯৪। অথচ এখন তাঁর দলের যা পরিস্থিতি, তাতে এর থেকে অনেক বেশি লোক ওঁৎ পেতে আছে ক্ষমতার স্বাদ পাওয়ার জন্যে। গত বিধানসভা ভোটে যারা হেরে গেছে, তারাই শুধু নয়, তার বাইরেও আরও অনেক অনেক লোক আছে, যাদেরকে এখনই ক্ষমতার স্বাদ পাইয়ে না দিলে আর সামলানো যাবে না। অথচ বিধানসভার আসন সংখ্যা বাড়ানো এখন কিছুতেই সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় একমাত্র বিধান পরিষদই পারে তাঁকে এই সঙ্কট থেকে উদ্ধার করতে এবং সেই জন্যেও তিনি এখন মরিয়া। যেহেতু কোনও মতাদর্শই তাঁর এবং তাঁর দলের কোনও সদস্যের মধ্যে কাজ করে না, সেহেতু স্বার্থসিদ্ধির জন্যে জনগণের কথা ভাবার কোনো তাগিদও তাঁর বা তাঁর দলের কারুর মধ্যে কাজ করে না। সুতরাং হোক পরিষদ, যাক জনগণ গোল্লার খাতায়।

গত এগারো বছরে রাজ্য সরকারে প্রায় কোনও নিয়োগ নেই। রাজ্যে এমন কোনও শিল্প স্থাপন নেই, যাতে নতুন করে শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীরা কাজ পেতে পারেন। বেকারের সংখ্যা হু হু করে বাড়ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের তুলনায় রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের বেতনের ফারাক আকাশ ছুঁচ্ছে। সরকারের কোনও হেলদোল নেই। তাদের নাকি টাকার বেজায় অভাব। রাস্তা-ঘাট, পানীয় জলের ব্যবস্থা, জল নিকাশি ইত্যাদি নাগরিক পরিষেবার সমস্ত কাজ থমকে দাঁড়িয়ে আছে নাকি টাকার অভাবে, কাজের নিশ্চয়তা হারিয়ে শিক্ষকেরা দল বেঁধে বিষ খাচ্ছেন, সরকার মনে করছে মেলা-খেলা-ডোল দিয়ে মানুষকে ভুলিয়ে রাখা যাবে। অন্ধকার ভবিষ্যতের মধ্যে তলিয়ে যেতে যেতে মানুষ দেখছে এর মধ্যেও অবলীলায় মুখ্যমন্ত্রী নিজের বেতন বাড়িয়েই চলেছেন, নিজের ব্যবহারের জন্যে শুধু হেলিকপ্টারে আর তিনি সন্তুষ্ট নন, এবারে ব্যবস্থা করছেন আস্ত একটা প্লেন ভাড়া করার। একদিকে সরকারের ধারের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়ছে, অন্যদিকে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে মুখ্যমন্ত্রী সহ সরকারের মন্ত্রী-আমলাদের বিলাসের বহর এবং এরই মধ্যে আবার নতুন করে তাঁরা কয়েক হাজার কোটি টাকা খরচের জায়গায় চলে যাচ্ছেন শুধু মাত্র ক্ষমতাকে আরও বেশি করে ভোগ করার জন্যে। এই অদ্ভুত পরিস্থিতি বেশিদিন চলতে পারে না, চলতে দেওয়া যায় না। এটা ঠিক যে, এ রাজ্যে বিধান পরিষদ পুনঃপ্রবর্তনের জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়োজনীয় অনুমোদন এখনও পাওয়া যায়নি। এ কথাও ঠিক যে, কয়েকটা রাজ্যের ধান্ধাবাজ সরকারের এই সংক্রান্ত প্রস্তাব এখনও আটকে আছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে, কিন্তু এটাও ঠিক যে এখনকার কেন্দ্রীয় সরকারকে কোনোমতেই বিশ্বাস করা যায় না—নিজেদের আখের গোছানোর জন্যে এরা যা খুশি করতে পারে। মনে রাখতে হবে যে এদের সহযোগী সংগঠন এবং পরামর্শ দাতা হিন্দু মহাসভা প্রথম থেকেই সাইমন কমিশনের সমর্থক ছিল, যে সাইমন কমিশনের সুপারিশ ছিল রাজ্যে রাজ্যে বিধান পরিষদ গঠন করার। সারা দেশের তাবড় দেশপ্রেমিকের আপত্তি সত্ত্বেও কমিশনের প্রতি মহাসভার সমর্থনে বিন্দুমাত্র চিড় ধরেনি। সুতরাং মানুষের ভবিষ্যৎ মানুষকেই বুঝে নিতে হবে। তাদের হয়ে কথা বলার মতো কেউ এখন আর বিধানসভায় নেই। সুতরাং যা করার, যেটুকু করার, সেটা বিধানসভার বাইরেই মানুষকে করে ফেলতে হবে। হাতে সময় কিন্তু খুব বেশি নেই। □

পঞ্চম পৃষ্ঠার পরে

প্রতিবাদ-প্রতিরোধের চেনা পথেই হাঁটবো

হল—পেট্রোপণ্য সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিতে লাগাম পরানোর দাবি। কোভিড পরিস্থিতিতে দরিদ্র মানুষের কাছে তো বটেই, এমনকি মধ্যবিত্ত মানুষের (সংগঠিত পরিষেবা ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত) দৈনন্দিন জীবনে মূল্যবৃদ্ধি মাথা ব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বিষয়ে কার্যকরী হস্তক্ষেপের সিংহভাগ দায় কেন্দ্রীয় সরকারের যেমন রয়েছে, তেমনই রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তার দিকটিও অস্বীকার করা যাবে না।

মূল্যবৃদ্ধির সাথেই সম্পর্কিত রাজ্য কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে বকেয়া মহার্ঘভাতার (বর্তমান ২৫ শতাংশ) প্রসঙ্গটিও খুব স্বাভাবিকভাবেই দাবিসনদে স্থানে পেয়েছে। গত দশ বছরে এই বিষয়ে আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতা হল, রাজ্য সরকার মহার্ঘভাতা প্রদানের প্রশ্নে শুধু উদাসীনই নয়, ধারাবাহিকভাবে নেতিবাচক অবস্থান গ্রহণ করে চলেছে। তবে বহু লড়াই-আন্দোলনের ফসল এই দাবি আদায়ে রাজ্য কর্মচারীরাও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তৃতীয় দাবিটি হল, কোভিড মোকাবিলায় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র গণটিকাকরণ প্রসঙ্গে। সমাজে 'হার্ড ইমিউনিটি' তৈরি করার জন্য দ্রুত সর্বজনীন টিকাকরণের লক্ষ্যে এগনোর জন্য যে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার, কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে তার অভাব স্পষ্টত লক্ষ্য করা যাচ্ছে। রাজ্যে টিকার যোগান বৃদ্ধি করার জন্য রাজ্য সরকারের তরফে কেন্দ্রের ওপর যতটা চাপ সৃষ্টি করা প্রয়োজন তারও অভাব রয়েছে বলেই আমরা মনে করি। সদ্য অনুষ্ঠিত বিধানসভা নির্বাচনের আগে ও পরবর্তী পর্বে রাজ্য সরকার নির্দিষ্ট কয়েকটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এগুলি রূপায়ণের দায়িত্ব বর্তেছে সম্পূর্ণতই রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ওপর। অথচ প্রশাসনের অভ্যন্তরে লক্ষাধিক পদ শূন্য। স্থায়ী নিয়োগ কার্যত বন্ধই। ফলে মুষ্টিমেয় কর্মচারীকে বিপুল কাজের বোঝা বহন করতে হচ্ছে। এর ফলে প্রশাসনিক কাজের পরিমাণগত, গুণগত উভয় চরিত্রই ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। আমরা দাবি করছি কোভিড সুরক্ষা বজায় রেখে দপ্তরে দপ্তরে ১০০ শতাংশ কর্মচারীদের হাজিরা চালু করা হোক। এছাড়া এই সময়ে প্রশাসনের অভ্যন্তরে আধিকারিকদের অমানবিক আচরণে শারিরীক ও মানসিক নির্যাতনের বলি হচ্ছেন কর্মচারী যা খুবই উদ্বেগজনক। তদন্ত করে যারা দোষী তাদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে। রাজ্য সরকার সমস্ত শূন্যপদ স্থায়ী নিয়োগের সিদ্ধান্ত পর্যায়ক্রমে গ্রহণ করলে, দ্বিমুখী ইতিবাচক ফল পাওয়া যেতে পারে—(১) প্রশাসনিক কাজের গতিবৃদ্ধি এবং (২) কর্মহীনতা বা বেকার সমস্যার আংশিক সমাধান। তাই রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি জনস্বার্থে এই দাবি উত্থাপন করেছে। এই দাবির সাথেই যুক্ত করা হয়েছে, আরও একটি দাবি। তা হল, প্রশাসনের অভ্যন্তরে বর্তমানে স্থায়ী কর্মচারীর সংখ্যাকে ছাপিয়ে গেছে চুক্তিভিত্তিক অস্থায়ী কর্মচারীর সংখ্যা। যারা সামান্য বেতনের বিনিময়ে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করছে। যাদের নেই কোনো পেশাগত নিরাপত্তা বা সামাজিক সুরক্ষা। সংগঠন দাবি করেছে, শূন্যপদে স্থায়ী নিয়োগের প্রক্রিয়ায় এই অংশকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সর্বশেষ দাবিটি হল, নীতিহীন ও প্রতিহিংসাপরায়ণ বদলির সমস্ত আদেশনামা প্রত্যাহার করতে হবে। প্রতিবাদী কণ্ঠকে বলপূর্বক দমন করার প্রশ্নে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের চারিত্রিক সদৃশ লক্ষণীয়। উভয় শাসকই স্বৈরাচারী পদক্ষেপ গ্রহণে সিদ্ধহস্ত। আমাদের সংগঠনের শীর্ষ নেতৃত্ব সহ সর্বস্তরের কর্মী-সংগঠকদের ওপর একাধিকবার এই স্বৈরাচারের খড়্গ নেমে এসেছে। সম্প্রতি একই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন এস এস কে এবং এম এস কে শিক্ষিকারা। উল্লিখিত পাঁচ দফা দাবি নিয়ে জেলা শাসকদের কাছে ডেপুটেশন দেওয়ার পর আমরা রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গত ৮ সেপ্টেম্বর এই জরুরি পাঁচ দফা দাবি নিয়ে প্রতিনিধিত্বমূলক ডেপুটেশন গিয়েছিলাম নবান্নে প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে পুলিশের সাথে বাক্‌বিতন্ডা ও উত্তপ্ত আলোচনা হয় এবং পরে সি এম ও দপ্তরে স্মারকলিপি জমা নিতে প্রশাসনকে বাধ্য করা হয়। মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে বলা হয় যে, তিনি কর্মসূচীতে আছেন। সরকারের পক্ষে পরবর্তীতে আলোচনা করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। আসলে বকেয়া মহার্ঘভাতাসহ ৫ দফা ন্যায্য দাবি নিয়ে আলোচনা ও যুক্তিতর্কে সরকার মুখোমুখি হতে ভয় পাচ্ছে। কারণ তাদের কাছে কোনো যুক্তি নেই। পরবর্তীতে আমরা নবান্নে সাংবাদিকদের সামনে পাহাড় প্রমাণ আর্থিক বঞ্চনাসহ দাবিগুলি নিয়ে আমাদের বক্তব্য তুলে ধরি এবং সরকার যে বধির হয়ে আছে তা মুখোমুখি হতে ভয় পাচ্ছে তা উল্লেখ করি।

আগস্ট '২১ মাসব্যাপী সারা রাজ্যজুড়ে ব্লক, মহকুমা, জেলা সদরে ও পরবর্তীতে ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২১ নবান্ন সহ কলকাতার ৭টি অঞ্চলে ব্যাপক কর্মচারীর ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ কর্মসূচীগুলিতে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। তাই অগামীতে কর্মচারী স্বার্থে রাজ্য সরকারকে দাবি আদায়ে বাধ্য করতে বৃহত্তর আন্দোলন সংগ্রামের লক্ষ্যে সর্বত্র প্রস্তুতি গড়ে তুলতে হবে। □

এন এম পি
কর্পোরেটের চরণে সেবা লাগি

মানস কুমার বড়ুয়া

ইংরেজিতে বাহারি নাম, ‘ন্যাশনাল মানিটাইজেশন পাইপলাইন’, সংক্ষেপে এন এম পি। এই নামের মোড়কে বিগত সাত দশক ধরে জনগণের পয়সায় তিল তিল করে গড়ে ওঠা রাষ্ট্রায়ত্ব সম্পদ বিক্রির ঢালাও তালিকা প্রকাশ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। বিগত ২৩ আগস্ট ’২১ এই তালিকা প্রকাশ করে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, আগামী চার বছরের মেয়াদে রাষ্ট্রায়ত্ব সম্পত্তি বেঁচে ৬ লক্ষ কোটি টাকা তোলা হবে। তালিকায় আছে সড়ক, বন্দর, রেল, স্টেডিয়াম, পেট্রো পরিকাঠামো ইত্যাদি প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। বিক্রির কৌশলে ‘পি পি পি’-সহ রয়েছে রকমারি মডেল। কর্পোরেট খরিদ্দারের কাছে সম্পত্তি ফেরি করার জন্য ঢাউস তালিকা নিয়ে রীতিমতো পুস্তক প্রকাশ করেছেন অর্থমন্ত্রী। পোর্টাল খুলে অর্থমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন, সরকার ‘ওয়ান স্টপ শপ’ খুলেছে, তাতে রয়েছে দ্রুত কেনাকাটা সেড়ে ফেলার অত্যাধুনিক ব্যবস্থা। যুক্তি হিসাবে হাজির করা হয়েছে নয়া উদারবাদের জমানার বহু চর্চিত শিল্প ও পরিকাঠামোয় বিনিয়োগ বৃদ্ধির অজুহাত। দেশের সম্পদ বিক্রির সেই পুরোনো অজুহাত সামনে এনে অর্থমন্ত্রী সীতারামন বলেছেন, দেশের পরিকাঠামোর উন্নতিতে বেসরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে জাতীয় সম্পত্তি বেসরকারী হাতে তুলে দিয়ে টাকা জোগাড়ের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই পদক্ষেপ বেসরকারীকরণ নয়, কারণ এই সম্পদের মালিকানা সরকারের হাতে রেখে বেসরকারী সংস্থাকে সময় সাপেক্ষে লিজ দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই লিজ দেওয়ার ভাবনা চিন্তায় অনেক ফাঁকফোকর আছে। তা পরবর্তীতে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে। কিন্তু একটা প্রশ্নের কোনো সদুত্তর আমাদের দেশের নয়াউদারীকরণের সমর্থকরা দিতে পারেননি। সেটা হল নয়া উদারবাদের জমানার অভিজ্ঞতায় দেশের নতুন পরিকাঠামোয় বিনিয়োগে বেসরকারী সংস্থার এগিয়ে আসার কোনো উদাহরণ আছে কি? নেই। অথচ বেসরকারী সংস্থার হাতেই এইভাবে সরকারী পরিকাঠামো এবং সম্পদ তুলে দিয়ে তা ‘পরিকাঠামোর বিকাশে বিনিয়োগ’ বলে কেন দাবি করছেন অর্থমন্ত্রী?

অর্থমন্ত্রী সীতারামন পরিকাঠামো সম্পত্তি বিক্রির রোডম্যাপ তৈরির দায়িত্ব দেবার ক্ষেত্রে কোনো সরকারী সংস্থার উপর ভরসা রাখেননি। এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ‘ক্রিসিল’-কে। এরাই খরিদ্দার বেছে বেছে বিক্রির তালিকা তৈরি করবে, পোর্টাল-এর নিয়ন্ত্রণ করবে। এরা তৈরি করছে ‘ওয়ান স্টপ শপ’। খদ্দেরদের বেশি ঘোরাঘুরি যাতে না করতে হয় এবং সম্পদ পছন্দ হলে যাতে ক্রয়-বিক্রয় প্রক্রিয়ায় কোনো জটিলতা না হয়, এসবের দায়িত্বে থাকবে ‘ক্রিসিল’ নামক বেসরকারি সংস্থা। সার সত্য কথা বলে দিয়েছে নীতি আয়োগ। তাদের বক্তব্য, দু’একটি স্ট্র্যাটেজিক সংস্থা ও সেগুলির পরিকাঠামো ছাড়া সবই বিক্রি করে দেওয়া হবে। স্ট্রাটেজিক সংস্থার যে তালিকা নীতি আয়োগ তৈরি করেছে তাতে দেখা যাচ্ছে হাতে গোনা দু-একটি সংস্থা ছাড়া সবই বিক্রির সুপারিশ করেছে নীতি আয়োগ।

ন্যাশনাল মানিটাইজেশন পাইপলাইনের প্রকাশিত দলিল অনুযায়ী ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অব ইন্ডিয়ার অধীন সড়কের ২২ শতাংশ, ৪০০টি রেল স্টেশন, ১৪০০ কিলোমিটার রেল লাইন, কোঙ্কন রেলওয়ের ৭৪১ কিলোমিটার, ৯০টি যাত্রীবাহী ট্রেন, ১৫টি রেলওয়ে স্টেডিয়াম, ২৬৫টি রেলওয়েতে গুড শেড, নির্বাচিত বেশ কিছু রেলওয়ে কলোনি, চারটি পাহাড়ি রেলওয়ে, ২৫টি গুরুত্বপূর্ণ বিমানবন্দর, ২৮৬০৮ সারকিট কিলোমিটারের পাওয়ার জেনারেশন সম্পত্তি, ১৬০টি কয়লাখনি, ১৪১৯৭টি টেলিকম টাওয়ার এবং ২.৮৬ লক্ষ কিলোমিটার অপটিক ফাইবার, এন টি পি সি ও এন এইচ পি সি-র পাওয়ার জেনারেশন অ্যাসেট, আই ও সি এল-র পেট্রোলিয়াম ও প্রোডাক্ট পাইপ লাইন, এইচ পি সি এল ও গেইল, ৯টি গুরুত্বপূর্ণ বন্দরের ৩১টি প্রকল্প, এফ সি আই এবং সেন্ট্রাল ওয়ার হাউসিং কর্পোরেশনের ওয়ার হাউসিং অ্যাসেটের সংরক্ষণ ক্ষমতার ৩৯ শতাংশ, জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়াম এবং স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়ার আরও তিনটি সম্পত্তি—ইত্যাদি সবই রয়েছে।

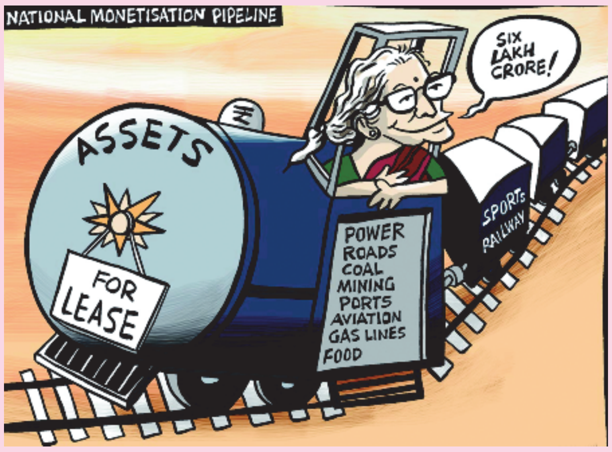

জাতীয় সম্পত্তি বেসরকারীকরণের প্রক্রিয়া ১৯৯১ সালে নয়া উদারনীতির প্রয়োগের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল কেন্দ্রের তৎকালীন কংগ্রেস সরকার। তারপর থেকে একের পর এক সরকার নানা মাত্রায় ও নানা কৌশলে এই নীতি কার্যকর করেছে। এন এম পি হল নবতম কৌশল যার উদ্দেশ্য একই। জাতীয় সম্পত্তি দেশী বিদেশী কর্পোরেটদের লুটের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া। মোদির জামানায় জাতীয় সম্পদের বেসরকারীকরণ বেপরোয়াভাবে হচ্ছে, যে কোনো মূল্যে এবং যেকোনো পন্থায়।

কেন্দ্রীয় সরকারের যুক্তি এন এম পি তালিকায় থাকা সম্পদগুলি ব্রাউনফিল্ড পরিকাঠামো সম্পদ (অর্থাৎ যে সম্পদগুলি এখন ব্যবহারযোগ্য নয়) অথবা আইডল অ্যাসেটস এবং এগুলিকে বিক্রি করা ঝুঁকিপূর্ণ নয়। এটা একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারণ বর্তমানকার ধান্দার ধনতন্ত্রের যুগে দেশী-বিদেশী কোনো কর্পোরেট এই ধরনের সম্পদে মূলধনী বিনিয়োগ করবে কেন, যেখানে তাদের পূর্ণ মালিকানার অধিকার নেই? যদি এই সম্পদগুলি এই সময়ে ব্যবহারযোগ্য না থাকে, তাহলে তারা কি ভারতের পরিকাঠামো উন্নয়নের স্বার্থে ঝুঁকি নিয়ে বিনিয়োগ করবে? কেন্দ্রীয় সরকার তাই হয়তো বোঝাতে চাইছে, যা মিথ্যা ছাড়া কিছুই নয়। আসল সত্য হল এই সম্পদগুলি বিক্রয় দেশের পক্ষে যতটা ঝুঁকিহীন বলা হচ্ছে তা একেবারেই ঠিক নয়। কর্পোরেট সংস্থা এগুলিকে বাণিজ্যিকীকরণ করে এবং দেশের জনগণের উপর নানাভাবে অতিরিক্ত আর্থিক বোঝা চাপিয়ে তাদের স্বার্থসিদ্ধি করবে। আর এই কাজে তাদের যোগ্য সহায়তা দেবে মোদি সরকার।

আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এই প্রসঙ্গে মাথাচাড়া দিচ্ছে। যখন সরকারের হাতে থাকা তথাকথিত ‘আইডল অ্যাসেটস’। দেশী বিদেশী কর্পোরেটের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে কোষাগারে অর্থ সরবরাহের জন্য বা মুদ্রাকরণের লক্ষ্যে। তখন এই সম্পত্তি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে মুদ্রাকরণের (মনিটাইজেশন-র) পর নির্দিষ্ট সময়ে ফেরত আসার পরবর্তীকালে তা পুনরায় আর মুদ্রাকরণের জন্য বাজারে ফেরত যাবে। এর ফলে সরকার কাগজে কলমে ঐ সম্পত্তির মালিক থাকলেও তারা এই সম্পত্তিকে কোনোভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না বা যেটুকু পরিষেবা দেবার সুযোগ আছে তাও দিতে পারবে না। সরকার কেবলমাত্র উক্ত সম্পত্তির পূর্বানুমানভিত্তিক মূল্য পেয়েই সন্তুষ্ট থাকবে। পূর্বের অভিজ্ঞতা বলছে যে বিনিয়োগকারীদের সন্তুষ্ট করতে সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ যতটা সম্ভব কম রাখার চেষ্টা করবে। এর ফলে দেশ ও জনগণ উভয়েরই ক্ষতি বহুমাত্রিক।

দ্বিতীয়ত বেসরকারি ক্ষেত্র নিশ্চিতভাবেই তাদের আয় বৃদ্ধি করতে লিজে নেওয়া সম্পত্তিগুলির আনসঙ্গিক ব্যয় হ্রাস করতে চাইবে। এইসব ব্যয় হ্রাসের মধ্যে থাকবে মজুরি সংক্রান্ত ব্যয়। এটা কার্যকরী করতে অবশ্যম্ভাবী ভাবে প্রয়োগ হবে শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন ও সামাজিক সুরক্ষা সহ অন্যান্য খাদে বরাদ্দ ছাটাই। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রগুলি এক্ষেত্রে যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে তা খর্ব করা হবে।

সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে ‘মানিটাইজেশন’ হল ‘তেলা মাথায় তেল দেওয়া’। পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য এটা করা হচ্ছে এই যুক্তি দেওয়া হলেও, আসলে এই ব্যবস্থা বৃহৎ ব্যবসায়ীদের মুনাফার ক্ষেত্র প্রসারিত করার স্বার্থে। যাতে তারা উপভোক্তার উপর বোঝা চাপিয়ে অথবা রাষ্ট্রীয় কোষাগারকে ব্যবহার করে মুনাফার পাহাড় গড়তে পারে। আরও ভালোভাবে বলতে গেলে এটা হল সেই ধরনের প্রকল্প যার মাধ্যমে বর্তমানে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যারা সম্পদের পিরামিডের শিখরে অবস্থান করছে, তাদের কাছে সম্পদের হস্তান্তর। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোনো নতুন সম্পদ সৃষ্টি হবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের এই ধনীমতোষণ নীতির বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই সোচ্চার হয়েছেন শ্রমিক কর্মচারী তথা সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ। নীতি পরিবর্তনের জোরদার ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের প্রবল ঢেউয়ের ধাক্কায় পরাস্ত করতে হবে এন এম পি-র মতো একপেশে জাতীয় সম্পদ বিক্রীর নীতি। □

কর্পোরেট পন্থী হিন্দুত্ববাদের আগ্রাসনের গর্ভে বাম পন্থার সম্ভাবনা : রতন খাসনবিশ

সংগ্রামী হাতিয়ার ৫০তম বর্ষে পা দিয়েছে, এটা জেনে আমি আনন্দিত। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র হিসেবে এই পত্রিকায় একটি বিশেষ দিশা রয়েছে। রয়েছে মতাদর্শের দৃঢ়তা। খুব কঠিন সময়ে কর্মচারী সমাজকে সঠিক পথ অন্বেষণে নির্দিষ্ট মতাদর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এই পত্রিকা। আমার আবেদন আপনাদের কাছে, ৫০তম বর্ষে গ্রাহক সংখ্যা উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি করে কর্মচারী সমাজের বৃহৎ অংশকে আবৃত করার উদ্যোগ আপনারা গ্রহণ করুন।

আজকের আলোচনার যে বিষয়বস্তু তাকে খণ্ড খণ্ড করে দেখলে আমরা দেখব, এর মধ্যে হিন্দুত্ববাদ আছে, কর্পোরেট পন্থা আছে, আছে আগ্রাসন প্রসঙ্গ এবং সর্বোপরি রয়েছে বামপন্থার সম্ভাবনার বিষয়টি। এখানে যে হিন্দুত্ববাদের কথা বলা হয়েছে, যা গোটা দেশে এখন দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, তার সূচনা বা জন্ম নাগপুরে। আরো নির্দিষ্ট করলে বলা যায়, এটি সাভারকরের রাজনৈতিক দর্শন। এই হিন্দুত্ববাদ আমাদের দেশে হিন্দু বলে যারা পরিচিত তাদের সকলের জীবন দর্শনের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ নয়। এই হিন্দুত্ববাদ মূলত উত্তর ভারত ও রামকেন্দ্রিক হিন্দুত্ববাদ। অর্থাৎ এটি সীমিত অর্থে হিন্দু। এর নিরিখে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতবাদ গড়ে তোলা হল। এর আগ্রাসনের লক্ষ্য সংবিধানে উল্লিখিত ভারত সম্পর্কিত সমগ্র ধারণাটি। অর্থাৎ ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে ধারণা, এই সমাজে কারা থাকবেন সেই সম্পর্কে ধারণা, প্রশাসন পরিচালনায় যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো, ধর্মনিরপেক্ষতায় গৃহীত সংজ্ঞা ইত্যাদি সবকিছুই আজ আক্রান্ত। আমি মনে করি, এই আক্রমণের যে গভীরতা তাকে শুধু আগ্রাসন বললেই সবটা বলা হয় না। কারণ এখানে শুধুমাত্র একটি ধারণাকে ভাঙা হচ্ছে না, তার পরিবর্তে একটি নতুন ধারণা যা আমাদের সংবিধান সম্মত নয় তাকে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আগ্রাসনের পরিবর্তে আত্মীকরণ শব্দটি সম্ভবত অধিক প্রযোজ্য। আমাদের দেশে স্বাধীনতার পর গণপরিষদে দীর্ঘ বিতর্কের মধ্য দিয়ে সর্বসম্মতিক্রমে এই সংবিধান গৃহীত হয়েছিল। অর্থাৎ সংবিধান গ্রহণের আগে বহু বিতর্ক হলেও শেষপর্যন্ত দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে সংবিধানিক রীতি পদ্ধতিকে সকলেই একমত হয়ে গ্রহণ করেছিলেন। সেই সংবিধানের মূলে আঘাত করা হচ্ছে। এর লক্ষ্য হল ভারত সম্পর্কে বিশ্বস্বীকৃত ধারণাটিকে পালটে দেওয়া। এর জন্য যে যে বিষয়গুলিকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে তার মধ্যে একটি হল ভাষা। হিন্দুত্ববাদের ভাষাগত ভিত্তি হল সংস্কৃত ঘেঁষা হিন্দী, যেটা উর্দু বিরোধী। সংস্কৃত ঘেঁষা এই হিন্দী ভাষা ব্রাহ্মণ্যবাদীর রাজনীতির ভাষা। আমরা জানি হিন্দী ভাষাও বিভিন্ন রাজ্যভিত্তিক আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কিন্তু হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি সংস্কৃত ঘেঁষা এক বিশেষ ধরনের হিন্দী ভাষাকে গোটা দেশে অন্যান্য ভাষাগুলিকে পেছনে সরিয়ে মূল ভাষা হিসেবে চাপিয়ে দিতে চাইছে, যদিও আমরা জানি, আমাদের দেশে সংবিধানে ১৪টি ভাষা মূল ভাষা হিসেবেই স্বীকৃত। হিন্দী এই ১৪টি ভাষার একটি হলেও রাষ্ট্রভাষা নয়। হিন্দী মূলত উত্তর ভারতে একটি সংযোগকারী ভাষা। কারণ দক্ষিণে এর ব্যবহার প্রায় নেই বললেই চলে। ব্রাহ্মণ্যবাদ তথা হিন্দুত্ববাদকে এক বিশেষ ধরনের হিন্দী ভাষাকে উত্তর ভারতের পাশাপাশি পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতেও চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমাদের পশ্চিমবাংলাও এই বিপদ থেকে মুক্ত নয়।

ভাষার ওপর আক্রমণের পাশাপাশি আগ্রাসনের দ্বিতীয় ক্ষেত্রটি হল দেশের ইতিহাস। এ যাবৎকালের গবেষণালব্ধ স্বীকৃত ইতিহাসকে বিকৃত করে নতুন করে ইতিহাস লেখানো হচ্ছে। যে ইতিহাস আন্দামান জেলে বন্দী থাকাকালীন ব্রিটিশদের কাছে আত্মসমর্পণকারী সাভারকরকে বীর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে। ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের ধারণাকে যে সমস্ত জাতীয় নেতা প্রাক্ স্বাধীনতা পর্ব থেকেই বিশেষভাবে প্রচারে গুরুত্ব দিতেন, তাঁদের ভূমিকাকে লঘু করে দেখানো হচ্ছে অথবা আড়াল করা হচ্ছে। যেমন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। ইতিহাস গবেষণা কেন্দ্রগুলি থেকে যে সমস্ত ইতিহাসবিদ উদার সমন্বয়কারী ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের ইতিহাস রচনা করেছেন, তাঁদের সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যেমন রোমিলা থাপার, ইরফান হাবিব। হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির পৃষ্ঠপোষকতায় যে নতুন ইতিহাস লেখা হচ্ছে তার একটি নির্দিষ্ট প্যাটার্ন রয়েছে। সেটা হল, প্রাচীন ভারতকে গৌরবান্বিত করা হচ্ছে। আজকের বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারগুলির সবই প্রাচীন ভারতের দখলে ছিল এমন আজগুবি তত্ব স্বয়ং দেশের প্রধানমন্ত্রী ইতিহাস সংসদে দাঁড়িয়ে বলছেন। প্রাচীন ভারতকে গৌরবান্বিত করার পাশাপাশি মুসলিম শাসন পর্বকে শুধুমাত্র আক্রমণকারী হিসেবে বিকৃত পরিবেশন করা হচ্ছে। অথচ সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে এই নয়া ইতিহাসবিদরা এক ধরনের ‘ইনডিফারেন্স’ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চলেছে। অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসন ভালো না মন্দ সেই সম্পর্কে তাদের কোনো বক্তব্য নেই। তৃতীয় আগ্রাসনের লক্ষ্য হল যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। এবং এককেন্দ্রীক শাসনের ওপর জোর দেওয়া। সংবিধান প্রণেতারা লিখেছিলেন বৈচিত্রময় এই দেশকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে হলে, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাই আদর্শ ব্যবস্থা। যেখানে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে থাকবে ক্ষমতার বিভাজন। এই ক্ষমতার বিভাজনে রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতার দাবি এক সময় জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে বামপন্থীরাই বলে চলেছিল। কিন্তু আজ ঠিক উলটো পথে হাঁটা হচ্ছে। চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হল, নীতির পরিবর্তে ব্যক্তি আধিপত্যবাদ। ‘মোদী হ্যায় তো উমকীন হ্যায়’। যদিও বিভিন্ন রাজ্যের নির্বাচনী ফলাফলে এটা প্রমাণিত হচ্ছে, যে ব্যক্তি আধিপত্যবাদী রাজনীতি ভারত নিতে চায় না।

হিন্দুত্ববাদের এই লক্ষ্য পূরণ সম্ভব, যদি একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক গোষ্ঠী তাদের মদত দেয়। যেমন হিটলারকে মদত দিয়েছিল জার্মান লগ্নীপুঁজি। এদেশেও কর্পোরেট লবী পূর্ণ শক্তি নিয়ে মোদীকে মদত দিচ্ছে। এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে বামপন্থীদের পাল্টা এজেন্ডা সেট করতে হবে। যেমন সকলের কাজ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দাবি। □

State Co-ordination Committee
49th Year, 3rd & 4th Edition, July-August 2021

Regd. No. : 18484/71

৬ দফা দাবিতে

কলকাতায় বিক্ষোভ রাজ্য কর্মচারীদের

মহাকরণ অঞ্চল

নবমহাকরণ অঞ্চল

পূর্বাঞ্চল

৮ সেপ্টেম্বর, ২০২১ মধ্য কলকাতার রানী রাসমনি এভিন্যুতে, ছয় দফা দাবিতে কেন্দ্রীয় সমাবেশ করার জন্য প্রশাসনের কাছে বহু আগেই অনুমতি চেয়েছিল রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। প্রশাসন অনুমতি দেয়নি। এমনকি মৌলালির রামলীলা ময়দানে সমাবেশ করার বিকল্প প্রস্তাবও রাজ্য প্রশাসন প্রত্যাখ্যান করে। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় সমাবেশের পরিবর্তে ঐ দিনই দুপুরে কলকাতার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ভবনের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচীর ডাক দেয় রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় সমাবেশের পাশাপাশি ঐ দিনই নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য সময় চেয়ে গত ১ সেপ্টেম্বর সংগঠনের পক্ষ থেকে পত্র দেওয়া হয়। মাঝের কয়েকদিন প্রশাসনের পক্ষ থেকে 'হ্যাঁ' বা 'না' কোনোকিছুই জানানো হয়নি। কিন্তু নির্ধারিত দিনের ঠিক আগের দিন থেকে নবান্নের পুলিশ আধিকারিকরা তৎপর হয়ে ওঠেন এবং সংগঠনের নেতৃবৃন্দ কখন নবান্নে পৌঁছোবেন ইত্যাদি বিষয় খোঁজ নিতে থাকেন। মুখ্যমন্ত্রীর সাথে বেলা ১২টায় দেখা করার অনুমতি চাওয়া হয়েছিল। ফলে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই সভাপতি আশিস ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিংহ এবং যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী নবান্নে পৌঁছোন। তাঁরা পৌঁছোনমাত্রই তাঁদের জানিয়ে দেওয়া হয়, মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনিক ব্যস্ততার কারণে দেখা করতে পারবেন না। পুলিশ আধিকারিকরা ৬ দফা দাবিসম্বলিত যে লিখিত পত্র নেতৃবৃন্দ সাথে করে নিয়ে গেছিলেন, তাঁদের হাতে জমা দিয়ে যেতে বলেন। নেতৃবৃন্দ মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে লেখা পত্র, মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরেই জমা দেবার দাবি করেন। বেশ কিছুটা সময় নেতৃবৃন্দের সাথে পুলিশ আধিকারিকদের আলোচনার পর, তাঁরা সংগঠনের দাবি মেনে দাবিসম্বলিত পত্র নবান্নের চোদ্দ তলায় মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে গিয়ে জমা দিয়ে আসেন। এদিকে সংগঠনের ডাকে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভসভাগুলিতে ভিড় ছিল যথেষ্ট। মূল্যবৃদ্ধি রোধ, বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদান, প্রশাসনে শূন্যপদ পূরণ, ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ্ স্কীমের ক্যাশলেস চিকিৎসার ঊর্ধ্বসীমা বৃদ্ধি প্রভৃতি দাবিগুলির প্রতি গোটা রাজ্যের ব্লক, মহকুমা ও জেলা স্তরের কর্মসূচীগুলিতে যেভাবে কর্মচারীরা স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশ নিয়েছিলেন, কলকাতার কর্মসূচীতেও এইদিন সেই স্বতঃস্ফুর্ততা লক্ষ্য করা গেছে। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতি ও রাজ্য সরকারের কর্মচারী স্বাথ বিরোধী পদক্ষেপগুলির জন্য কর্মচারী সমাজের মধ্যে ক্ষোভ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কলকাতা কালেক্টরেটে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সহ-সম্পাদক দেবব্রত রায়। এই সভায় নবান্ন থেকে ফিরে অংশ নেন সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও যুগ্ম-সম্পাদক। কালেক্টরেট ছাড়াও সভা হয় নব মহাকরণ ভবন, বিকাশ ভবন, বেলেঘাটার বাণিজ্যকর ভবন, খাদ্যভবন, ভবানীভবন প্রভৃতি প্রশাসনিক ভবনের সামনে।

৮ সেপ্টেম্বর দিনটিতেই ১৯৫৬ সালে আত্মপ্রকাশ করে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। এই বিষয়টি সমগ্র কর্মসূচীগুলিতে বাড়তি মাত্রা ও আবেগ মুক্ত করেছিল।

দক্ষিণাঞ্চল

মধ্যাঞ্চল

লবণহ্রদ অঞ্চল

নার্সেস এ্যাসোসিয়েশনের ডেপুটেশন ও বিক্ষোভ কর্মসূচী

করোনা অতিমারীকালে হাসপাতালে অপ্রতুল বেডের সংখ্যা, ঘনঘন চিকিৎসার প্রোটোকল বদল করার মধ্যে দিয়ে সরকারী চিকিৎসা ব্যবস্থার সুফল সাধারণ মানুষ পাচ্ছেন না। এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন সরকারী নার্সরা। গত ১৩ সেপ্টেম্বর (মঙ্গলবার) এন আর এস হাসপাতালে এসএলটি হলে ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সেস এ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এক বিক্ষোভ সভায় নেতৃবৃন্দ বলেন, করোনা অতিমারীকে সাধারণ মানুষ যেমন চিকিৎসা বাজি রেখে পরিষেবা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, তেমনি 'ফ্রন্ট লাইন যোদ্ধা' হিসেবে জীবন বাজি রেখে পরিষেবা দেওয়া সত্ত্বেও বঞ্চনার শিকার নার্সরা। এর বিরুদ্ধে রাজ্যজুড়ে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে এদিনের সভা থেকে।

এদিনের বিক্ষোভ সভায় রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতা আশিস ভট্টাচার্য বলেন, কোভিড পরিস্থিতিতে যাঁরা জীবন বাজি রেখে মানুষের স্বার্থে প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছেন তাঁদের সঙ্গে সরকার বঞ্চনা করছে। পর্যাপ্ত সামগ্রী নার্সরা পাচ্ছেন না। ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সেস এ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদিকা নিবেদিতা দাশগুপ্ত বলেন, কোভিড যোদ্ধারা যেভাবে কাজ করে চলেছেন তাঁরা কেন এক মাসের অতিরিক্ত বেতন পাবেন না? নার্সিং কর্মচারীদের নানা ধরনের পেশাগত ও পদন্নোতি পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়ে চলেছেন। অবিলম্বে এগুলির ব্যাপারে কার্যকর করতে হবে সরকারকে।

এদিনের বিক্ষোভ সভায় বক্তারা আরো বলেছেন, বিগত দু'বছর ধরে স্বাস্থ্য এবং নার্সিং বিভাগের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে চিকিৎসা পরিষেবা এবং নার্সিং ক্যাডারের পেশাগত সমস্যা নিয়ে আলোচনার পরেও তা সেভাবে সমাধান হয়নি। বেশ কয়েকটি বিষয়ে নির্দিষ্টভাবে প্রতিশ্রুতি মিললেও শেষপর্যন্ত তা অমীমাংসিতই থেকে গেছে। তার মধ্যে অন্যতম ছিল ৫ বছর বয়সের ঊর্ধ্বের নার্সদের কোভিড ওয়ার্ডে পাঠানো যাবে না। কিন্তু তা এখনও বন্ধ হয়নি, একইভাবে চলছে। অবিলম্বে সরকারের হস্তক্ষেপ চাই। সরকারী স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়ন ঘটাতে হবে। আর্থিক দাবিদাওয়ার সুষ্ঠু সমাধান সহ কোভিড আক্রান্ত ও মৃত কর্মচারীদের সরকারী আদেশানুসারে দ্রুত আর্থিক সাহায্য প্রদান করতে হবে সরকারকে।

সভার শুরুতে প্রস্তাব পেশ করেন এ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদিকা পিকু ব্রহ্ম। সভায় এ্যাসোসিয়েশন অব হেলথ সার্ভিস ডক্টরস-এর সভাপতি ডাঃ অনুপ রায়ও বক্তব্য রাখেন। সমাপ্তি বক্তব্য রাখেন এ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি দুর্গা রায়। সভা পরিচালনা করেন স্বস্তিকা সরকার, সীমা সাহা ও দুর্গা রায়কে নিয়ে গড়া সভাপতিমণ্ডলী। □

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি আশিস ভট্টাচার্য

সাধারণ সম্পাদিকা নিবেদিতা দাশগুপ্ত

বিক্ষোভ সভায় জমায়েতের এক অংশ

ডিউটির ফাঁকে সভায় নার্সিং কর্মচারীরা

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
ই-মেল ঃ sangramihatiar@gmail.com
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত।